পলাতক

সুবোধ চন্দ্র মজুমদার

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলিকাতা

পলাতক

ভয়ে ঘৃণায় আমার শরীর কণ্টকি প জায়গায় রয়েছেন।
দুশ্চরিত্র লোকটাকে চোখে না দেখলেও তা। আজ আবার
শুনেছিলাম। জমিদার-বাড়ীর পাহাড়ী দ্বারোয়া পিসিমার
ছোটবেলায় এ গ্রামে এসে পরে সে-বাড়ীরই এক মেয়ের স্বও।
চুরি ক'রে এখান থেকে পালিয়ে গেছিল। তারপর আরও
অনেক জায়গায় অনেক অপকর্ম করেছিল। আমি জিগগেস
করলাম, কোথায় যাব ?

শহরে।

কেন ?

তোর বোন ডেকেছে।

আমার কোন বোন নেই শহরে।

কাঠগোলার পেছনে বকুলগাছওয়ালা বাড়ীতে থাকে, ব'লেই অন্ধকারের মূর্তিটা মিলিয়ে গেল আরও অন্ধকারে, জটিল ধাঁধাঁয় ফেলে গেল আমাকে। আমার বোন ওখানে এল কিক'রে, আর এই চোরটাই বা তাকে চিনল কিক'রে! অনেক ভেবেও কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। তবু এক-পা দু-পা করে চলতে লাগলাম শহরের দিকে। শিশুকাল থেকে বোনেদের স্নেহ পেয়েই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, 'বোন' কথাটা শুনলেই কেমন যেন মায়াচ্ছন্ন হয়ে যায় মনটা। তাদের কোনো আহ্বানকে কিছুতেই পারিনে উপেক্ষা করতে। অনেকক্ষণ হেঁটে হোঁচট খেয়ে অবশেষে পৌঁছলাম এসে শহরে।

পলাতক

ন বকুলগাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়ে
হল খুব একটা খারাপ জায়গায় এসে
ভাল মানুষেরা আসে না এখানে। এমনসময়ে
। পোষাক পরা একটা লোককে আমার দিকে আসতে
দেখে ভয়ে ভয়ে আমি গিয়ে বকুলগাছটার আড়ালে
লুকোলাম। সংগে সংগে প্রদীপ হাতে একটি মেয়ে এসে
আমার সম্মুখে দাঁড়াল। আমার হাত ধ'রে আব্দারের সুরে
বলল, ঘরে চল, সমীরদা। একটা বিশ্রী ভয় ও ঘৃণায়
শিউরে উঠে আমি এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু তার
মুখের দিকে আবার চাইতেই আমার মনের মধ্যে ভেসে
উঠল ছেলেবেলার মধুময় রংগীন দিনগুলি। আমার এক
পিসিমার একমাত্র সন্তান বাসন্তী। খুব অল্প বয়সে বিধবা
হয়ে ওর মা ওকে মাত্র তিনমাসেরটি নিয়ে আমাদের বাড়ী
এসেছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ীতে থেকে একটা পাঠশালায়
শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আমার
চেয়ে মাত্র দুমাসের ছোট হ'লেও বাসন্তী আমাকে দাদা ব'লে
ডাকত, ভাইফোঁটার দিন প্রণামও করত। লেখাপড়ায় সে
ছিল আমার চেয়েও ভাল। দুজনে আমরা এক সংগে
থাকতাম। একজন আরেকজনকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে
ভালবাসতাম। পিসিমাকে আমরা মনে করতাম পৃথিবীর মধ্যে
সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে ভাল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল
পিসিমা বাসন্তীকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন। আরও বড়

হয়ে শুনলাম তিনি খুব খারাপ হয়ে খারাপ জায়গায় রয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম তাঁর কথা। আজ আবার বাসন্তীর মুখের মধ্যে ভেসে উঠল আমার সেই স্নেহময়ী পিসিমার মুখশ্রীখানি। বাসন্তী আগেরই মতো তেমনি সুন্দর আছে আজও।

বাসন্তী আরও আব্দারের সুরে বলল, চেয়ে আছ কি, সমীরদা, আমি বাসন্তী। তোমাদের ডাকপিয়নের কাছে তুমি ফিরে এসেছ শুনেই লোক পাঠিয়েছিলাম তোমাকে আনতে, সারাদিন ধ'রে ব'সে আছি তোমার খাবারটা নিয়ে, কতকাল পরে আজ আবার তোমার সংগে খাব।

আশ্চর্য কাণ্ড! আমি কোথায় ছিলাম, কবে এসেছি এসব খবর রেখে বাসন্তীর কি কাজ? আমি বাসন্তীর সংগে ঘরে যাওয়ার জন্য বলতে যাচ্ছিলাম 'চলো' এমনসময় আমার আবার মনে পড়ল আমি একটা খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা খারাপ মেয়ের সংগে কথা বলছি। মেজাজটা আমার হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। হ্যাচ্‌কা টানে তার হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম আমাদের গ্রামের দিকে। পিছন থেকে বাসন্তী বলল, আমার একটা কথা শুনে যাও, দাদা। চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম, বাজে মানুষের সংগে কথা বলি নে আমি।

কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌ করছিল গাটা। গ্রামে ফিরেই প্রথম খুব ভাল ক'রে স্নান করলাম। একটু বেলা হলে পিয়ন এসে আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। সুন্দর ঠিকানা লেখা দেখে

বুঝলাম আমার মায়ের চিঠি। লিখেছেন আমি যেন গিয়ে মামাবাড়ীতে থেকে স্কুলে পড়ি, সেখানেও চিঠি দিয়ে দিয়েছেন। বিস্ময়ের আর সীমা রইল না আমার। আমার বাবা দরিদ্র ছিলেন ব'লে মামাবাড়ীর কে যেন মাকে একবার অবজ্ঞা ক'রে কথা বলেছিল, তারপর থেকেই মা সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন সে-বাড়ীর সংগে। কত অসহায়া হয়ে যে মায়ের মতো জেদী মানুষ নিজের সংকল্প ভাংগতে রাজী হয়েছেন সেকথা ভেবে আমার চোখে জল এসে পড়ল। তাঁর সংকল্প রক্ষার জন্য তিনি আমাদের ওপর কত নির্মম হতেন, নিজেকে কতই না লাঞ্ছিত নিপীড়িত করতেন। আমি কোনো অসভ্য বা রুচিহীন কথা বললে তিনি আমার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিতেন। তখন মনে হ'ত কোনো মায়া মমতার লেশও নাই তাঁর মনে।

অগত্যা যাত্রা করলাম মামাবাড়ী রাজগাঁ অভিমুখে। কিন্তু পথে যেতে যেতে মনে বড় ভয় হ'তে লাগল। আমার মামারা যেমন সম্ভ্রান্ত তেমন সমৃদ্ধ। হালচাল তাঁদের বিশেষ মার্জিত। কোনো অসভ্যতা তাঁরা সইতে পারেন না। সেখানে প্রাণ খুলে হাসতে নেই, কাশি পেলে কাশতে নেই, পেট ভরে খেতে নেই। আরও কত কি শুনেছি মামাবাড়ী সম্বন্ধে। বড়মামীমা, তাঁর মেয়ে বিলাত-ফেরতা প্রভাদি, আর তাঁর ছেলে আমাদেরই সমবয়সী বারীনকে তো আমি আমাদের এক আত্মীয় বাড়ী নিজের চোখেই দেখেছি। আমার মতো কুশ্রী গেঁয়ো ছেলেকে যদি তাঁরা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন!

প্রচণ্ড মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রি রি করছে চারদিক। বইয়ের বোচকা কাঁধে নিয়ে খালি পায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে আমি মাঠের পথ বেয়ে চলছি। আর ভাবছি, যাব কি যাব না? কত বড় এ্যারিষ্টোক্রেট তাঁরা, কত রকম এটিকেট তাঁদের, আমি থাকব কিক'রে তাঁদের মধ্যে? যত এগুই ভয় তত বাড়ে, বুকের ভিতরটাও যেন তেষ্টায় শুকিয়ে যায়, আগুনের হল্কা বেরোয় নাক কান দিয়ে। আমি যেমন বাসন্তাকে অপমান ক'রে ছেড়ে এসেছি সেরকম মামাবাড়ী থেকে আমাকে যদি তাড়িয়ে দেয়?

বহুক্ষণ হেঁটে বহু জিগগাসাবাদ ক'রে শেষে রাজগাঁ এসে পৌঁছলাম। মামাদের বাড়ীটা যে চিনি নে। কাকে জিগগেস করব ভাবছি, চোখে পড়ল মাঠের কাঠফাটা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক বামুনঠাকুর একটা গাইকে বেদম পিটছে আর বলছে, গরুর পো, বাড়ী নিয়ে তোকে যদি আজ না খেয়ে ফেলি তো আমি ঈশান চক্কত্তির পোলা হরকুমার চক্কত্তি না। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, গরুর মেয়েটাকে আপনি গরুর পো বলছেন, ঠাকুরমশাই? তিনি আমার কথায় ভ্রুক্ষেপ না ক'রে গাইটাকে পিটতে পিটতে আবার বললেন, এত ক'রেও দুইতে পারলাম না, তোকে আজ আমি খেয়ে ফেলব। আমিও ব'লে ফেললাম, ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে গরু খাবেন, ঠাকুরমশাই? আর যাও কোথা। তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে তিনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন,

বামুনের ছেলেকে গরু খাওয়ালি তুই, হারামজাদা, এত বড় আস্পর্ধা তোর, দাঁড়া, জমিদার বাড়ী বলে দিয়ে মজা দেখাচ্ছি তোকে। বলেই তিনি লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেলেন।

গাইটার যথেষ্ট দোষ ছিল। কিছুতেই সে তুইতে দিচ্ছিল না। যত মার খাচ্ছিল ততই তার বেয়াড়াপনা বেড়ে উঠছিল। আর রোদের ঝাঁজে ঠাকুরমশাইর মাথাটাও ততই গরম হয়ে উঠছিল। এখানে পিটিয়ে তাঁর আশ মিটছিল না ব'লেই বাড়ী নিয়ে তাকে ভালমতো পিটবার উদ্দেশ্যে তিনি বলছিলেন ওসব কথা। তবু গাইটার করুণ অবস্থা দেখে প্রাণটা আমার কেমন ক'রে উঠল। আমার মা বলতেন সব জীবেরই মানুষের মতো ব্যথাবোধ আছে, তারাও দুঃখ পায় মানুষেরই মতো, মিছামিছি গাছপালাকেও দুঃখ দিতে নেই। আমি গাইটাকে খুলে পাশের ডোবাটার ধারে নিয়ে জল খাইয়ে একটা গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখলাম। সে আমার দিকে চেয়ে চোখের জল ফেললে। মনে হ'ল কি যেন সে আমাকে বলতে চাইছে।

এক কৃষক রমণী চলেছিল পথ দিয়ে। সে আমাকে বলল, খোদা তোমার ভাল করব। আমি তাকে জিগগেস করলাম,

বিশ্বাসবাড়ী যাব কোন্ পথে?

ভুইয়াবাড়ী যাইবা?

হুঁ।

কয়টাকা মাইনা পাইবা?

আমি অমনি থাকব।

অমনি থাকবা ক্যান্?

তাঁরা আমার আত্মীয়।

হুঃ বড়লোকের গরীব আত্মীয়, তেলে জলে মিশ খায়?

আমি জিগগেস করলাম, যাওয়ার পথটা কোন্ দিক দিয়ে?

তবে মেজ-বৌমার দয়ার শরীর, সে তোমারে ঠকাইব না।

তিনিই তো আমার মেজমামীমা।

আপনি কি শৈলবালাদির ছেইলা?

মুহূর্তেই 'তুমি' থেকে আমি 'আপনি' হয়ে উঠলাম। জীবনে এই প্রথম আমাকে 'আপনি' বলল, কি যে মিষ্টি লাগল শুনতে তা আর বলে শেষ করা যায় না। বললাম, হাঁ। সে বলল, মা কেমন আছেন এখন? আমাগ যে কত উপোকার করছেন তার আর লেখাজোখা নাই। আমার আদাপ জানাইবেন তারে।

আমি বললাম তোমার কথা বলব যখন তাঁর সংগে আবার দেখা হবে। এখন আমাকে পথটা একটু দেখিয়ে দাও।

ঐ বাগানগুলির পাছেই ভুইয়াবাড়ী। আরেকটু গেলেই দেখতে পাইবেন মাষ্টার-দিদিমণির ইস্কুলটা।

মাষ্টার-দিদিমণি কে?

সব্বনাশ, তার নামও শোনেন নাই! অন্নপূন্না মা, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সন্ন্যাসী মানুষ ধম্মকম্ম নিয়া থাকেন,

আর গরীব দুঃখীর ছেইলা মাইয়া পড়ান। আমি জিগগেস করলাম, কে তিনি ?

মেজবৌমার বিধবা ছোটবোন চাঁপাদিদিমণি।

কৃষাণী চলে গেল। কিন্তু আমার ভয়ের মাত্রা গেল আরও বেড়ে। মেজমামীমার ছোটবোন চাঁপামাসীমার সম্বন্ধে অনেকের মুখ থেকে অনেক কথা শুনেছি। বয়স তাঁর মাত্র ঊনীশ, কুড়ি বছর কিন্তু তাঁকে নাকি সমীহ ক'রে চলে বাড়ীসুদ্ধ সবাই। গান গাইতে, ছবি আঁকতে, সেলাই করতে তাঁর জুড়ি দেখা যায় না। বাংলা সংস্কৃত হিন্দী সব পরীক্ষায় পাশ ক'রে এখন ইংরেজী শিখতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ের কয়দিন পরেই বিধবা হয়ে তখন থেকে লেখাপড়া আর ধর্মকর্ম নিয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করছেন। তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত ধর্মশীলা মহিলা যদি আমার মতো গেঁয়ো নাস্তিককে মানুষ ব'লে গণ্য না করেন ?

এসব ভাবতে ভাবতে মামাবাড়ী এসে পৌঁছলাম। দোর গোড়ায় যেতে না যেতেই অনেক লোক এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি যেন একটা তামাসার ব্যাপার। একটি ছেলে এসে আমার ময়লা ছেঁড়া জামাটা ধরে দিল একটা টান। বারীন আমার জামার নীচে ছেড়ে দিল কতগুলি কাঠপিঁপড়ে। খিলখিল ক'রে সকলে হেসে উঠল। আর বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হতবুদ্ধি হয়ে।

ছোটদিদিমা এসে বললেন, হরকুমার ঠাকুরকে গালি দিয়েছিস্ কেন? রুক্ষমূর্তি বড়মামামা এসে বললেন, এ বাড়ীতে আবার তোর কি কাজ পড়ল? ছোটদিদিমা বললেন, কচি বাপকে খেয়ে এয়েছ, এখানে আবার কাকে খেয়ে কি সব্বনাশ করবে, তোমার কাজ নেই বাপু এখানে থেকে। বড়মামীমা বললেন, জানোয়ারটা থাকতে এসেছে এ্যারিষ্টোক্রেট ফ্যামিলিতে, ওকে জায়গা দিয়ে আমরা এখন গবর্ণমেণ্টের কাছে গুডনেমটা নষ্ট করি। প্রভাদি এসে আমাকে বললেন, এক্স্‌কিউজ মি. তুমি কি চাও?

মা আমাকে এখানে থেকে পড়তে বলেছেন।

তোমার স্কুলের মাইনের টাকা কে দেবে?

ফ্রা পড়ার ব্যবস্থা নাকি করা যায় এ বাড়ী থেকে।

সন্ধ্যা-বৌদি বললেন, ডোনেশন দেওয়ার জন্য দাদু একজন পড়াতে পারেন। বড়মামীমা বললেন, সে অনারেবল্ স্কলারশিপ, বারীনকে দেওয়া হবে। প্রভাদি বললেন, চাকরদের গিয়ে বল, থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। এমনসময় জামার নীচে একটা পিঁপড়ে কামড়াতেই জ্বালায় অস্থির হয়ে আমি জামাটা তুলে ফেললাম। অমনি প্রভাদি স্থূল দেহটাকে নাচিয়ে বলে উঠলেন, বিষ্ট্! চমকে উঠে আমি জামাটা ছেড়ে দিলাম। সবাই হাসতে লাগল আমার দশা দেখে। বড়মামীমা বললেন, অসভ্য আনকালচারড।

অকস্মাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল সব হাসাহাসি গালাগালি। বারীন সভয়ে ব'লল কাকীমা! মাসতুতো ভাই ছোড়্‌দা বলে উঠলেন, মেজমামীমা! সবার চোখ পড়ল অন্দর মহলের খোলা দরজাটার দিকে। কেউ কেউ আতংকে সরে পড়ল সেখান থেকে। আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল।

বিদেশবাসী আমার মেজমামা এই বাড়ীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও অর্থবান। মেজমামীমা অন্যান্য মামীমাদের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। দু'জনেই নিজেদের সর্বস্ব বাড়ীর সবার জন্য নিঃশেষে ব্যয় করেন। তারওপর তাঁদের প্রকৃতি অসাধারণ রাশভারি। সেজন্য সবাই সন্ত্রস্ত থাকে তাঁদের কাছে। মেজমামীমার কথা এ বাড়ীতে বেদবাক্য। আমার সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন সে ভয়ে আমি পল গুণতে লাগলাম। মনে মনে বাসন্তীকে অপমান ক'রে আসার জন্য ক্ষমা চাইলাম।

একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এক দৃপ্ত গম্ভীর নারীমূর্তি। মেজমামীমাকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেছি বলে মনে হ'ল না, তবু পলকের দেখাতেই মনে হ'ল এ মানুষ সহজ নয়। কোনোরকম ফাঁকি চালাকি চলে না এঁর সংগে। নীরব নত হয়ে শুধুমাত্র আজ্ঞা পালন করে যাওয়াই এখানে নিরাপদ। রাজ-রাণীর মতো সগৌরব পাদক্ষেপে তিনি আসতে লাগলেন আমাদের দিকে। ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল।

মেজমামীমা এসেই নিজের হাতে আমার ঘাড় থেকে ভারি বোঝাটা নামিয়ে ফেললেন। চাকরকে বললেন ছোটঘরে নিয়ে যেতে। তারপর সস্নেহে আমার একটা হাত ধরে নিয়ে চললেন বাড়ীর ভিতরে। সবাই নির্বাক হয়ে ফাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। একটা ছোট ঘরে আমাকে এনে তিনি বললেন, এ ঘরে তুমি থাকবে। পাশের ঘরেই থাকে তোমার চাঁপামাসীমা, সেও পড়বে তোমার সংগে, যখন যা দরকার চেয়ে নেবে তার কাছ থেকে। মেয়েদের কথায় মন খারাপ না ক'রে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাও।

দুই

জনতার মাঝেই বিরাজ করে নির্জনতা। জনবহুল বাড়ীর অবস্থা ঠিক জনাকীর্ণ শহরের মতো। কোলাহল ঠেলাঠেলির মধ্যে প্রত্যেকেই থাকে একা। সবাই থাকে নিজের সুখ সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত, অন্যের কথা ভাববার সময় নেই কারও। এ বাড়ীর অবস্থাও তাই। দিনের পর দিন একজন নতুন মানুষ এসে এখানে থেকে গেলেও অনেকে হয়তো জানতেও পায় না সেকথা। ভালই হ'ল, আমাকে লক্ষ্য করবে না বিশেষ কেউ। আমিও যাব না. বড়লোকদের কাছসুদ্ধ। দেখাও করব না

চাঁপামাসীমার সংগে। কি দরকার বড়লোকদের কাছে গিয়ে। একে আমার বয়স হয়ে গেছে স্কুলে পড়ার পক্ষে বেশী, তারওপর আমাকে দেখায় বয়সের চেয়েও অনেক বড়। সেজন্য মনে মনে হয়তো তিনি অবজ্ঞাই করবেন আমাকে।

মেজমামীমা আমাকে রেখে বেরিয়ে গেলে আমি ঘরের জিনিসপত্র সব দেখতে দেখতে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। চাঁপামাসীমাও হয়তো মেজমামীমার মতো রাশভারি। আমার দরিদ্র হালচালকে নিশ্চয়ই খুব অপছন্দ করবেন। তিনি যদি আমার সংগে পড়তে আসেন তাহলে তার সংগে দেখা না ক'রেও উপায় থাকবে না। এমনসময় আমারই সমবয়সী ছিপছিপে সুন্দর একটি মেয়ে একবাটি পায়েস নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, খাও। পায়েস আমি খুব ভালবাসতাম, কত বছর আগে যে পায়েস খেয়েছিলাম তার ঠিক নেই, তবু খেতে বড় লজ্জা করল আমার। আমার খাওয়াটা পেটুকের মতো ছিল ব'লে মেয়েরা দেখে হাসত, তাই আমার মা ছাড়া অন্য মেয়েদের কাছে আমি খেতাম না। বাটিটা রেখে মেয়েটি চলে গেলে পর আমি খেতে সুরু করলাম। কিন্তু যেই সুরু করেছি অমনি আবার মেয়েটি ফিরে এল একটা তেলের শিশি হাতে নিয়ে, বলল, খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম ক'রে নাইতে যেয়ো। কতক্ষণ পরে আমি মুখ তুলে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সেও তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে, বোধহয় আশ্চর্য হয়ে গেছে আমার গেঁয়ো ধরণের খাওয়া

দেখে। আমাকে লজ্জা পেতে দেখে সে উঠে গিয়ে আমার বইগুলি টেবিলের ওপরে গুছাতে লাগল। আমার বড় ভাল লাগল তাকে। মনে মনে প্রার্থনা করলাম চাঁপামাসীমা যেন আমাকে দেখাশোনা না করেন, এই মেয়েটির কাছ থেকেই আমি চেয়ে নেব আমার যখন যা দরকার। আমাবি মতো সেও হয়তো এবাড়ীর গলগ্রহ, তাই সে বুঝবে আমাব দুঃখ।

মেয়েটি চলে গেলে আমি নিজেই বইগুলি গুছানো শেষ করলাম। তারপর বেরিয়ে গেলাম স্নান করতে। বিরাট বড় আমার মামাবাড়ীটা। আগের কালের সামন্তদের দুর্গনিবাসেব মতো। পরিখা আর জংগল দিয়ে ঘেরা শতাধিক বিঘা জমি, তারমধ্যে আছে বহু বাগান পুকুর ক্ষেত। কোনো সংস্রব নেই গ্রামবাসীদের সংগে। একটু ঘুরে ফিরে এসব দেখে পুকুরে নাইতে নেমেছি এমনসময় কোথা থেকে এসে বড়মামীমা বললেন, জামা দুটো কেচে দে দেখি সাবান দিয়ে। ব'লেই তিন-চারটে জামা আব একটুকরো সাবান ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার দিকে। এ-বাড়ীব কেউ যে আমাকে ডেকে একটু কথা বলল, এদের একটু কাজেও যে আমি এলাম একথা ভেবে খুব উল্লসিত হলাম। আমাব মা বলতেন বিনা প্রতিদানে কারও কাছ থেকে কোনো কিছু নেওয়া খুব হীনতা।

সানন্দে আমি জামাগুলি কেচে ধুয়ে দিলাম। আমার মা ভাবতেন আমি নিষ্কর্মা, লেখাপড়া আর স্বদেশী ছাড়া কিছুই

তে পারি নে। কিন্তু বড়মামীমা আমার কাজ দেখে
যারনাই খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ খুব ভাল ছেলে হতে
পারবি তুই। বারীনকে বলে দেব তোকে যেন একটু এটিকেট,
ভদ্রতা শিখিয়ে দেয়। ক্লাস-নাইনে প'ড়লেও সে জানে শোনে
অনেক। হাজার হোক, ওরা এ্যারিষ্টোক্রেট ফেমিলির ছেলে,
ওদের কালচারই হচ্ছে আলাদা। প্রভার চালচলন দেখে তো
আই. সি. এস-দের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়।
স্নান সেরে এসে ঘরে বসে উদগ্রীব হয়ে খাওয়ার প্রতীক্ষা
করছিলাম। একটি ঝির চোখ পড়ল আমার ওপর।
বিরক্ত হয়ে সে বলল, এখনও ব'সে আছ, যাও, ওই ঘরে খেতে
যাও। ভয়ে ভয়ে চাঁপামাসীমার ঘরের দরজাটা এড়িয়ে
অন্য পথ দিয়ে খাওয়ার ঘরে গেলাম। খেতে বসলাম মামাতো
ভাইদের সংগে। খুব অহংকার হ'ল আমার মনের মধ্যে বড়বড়
ঝকঝকে থালা বাটি গ্লাস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে চারদিক,
ঝিয়ে জল দেয়, ঠাকুরে ভাত দেয়, এত বড়লোকের বাড়ীতে আমি
এর আগে আর খাইনি কখনও। মামাবাড়ীর সকলের প্রতি
কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে গেল মনটা আমার।
এক এক ক'রে ভাত দিতে দিতে ঠাকুর আমার পাতে
ভাত দিল। খুব খুশী হয়ে ভাত মাখতে যাচ্ছি, হঠাৎ চমকে
উঠলাম একটা বিকট ধমকে। মারমুখী হয়ে হাতটা
নেড়ে বড়মামীমা বললেন, তোমার আক্কেলটা কি ঠাকুর, সরু
চালের ভাতগুলি নষ্ট করলে ওর পাতে দিয়ে! ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা

খেয়ে ঠাকুর অমনি ভাতগুলি তুলে নিল আমার থালা থেকে। তারপর সেগুলি ফেলে রেখে মোটা চালের ভাত এনে দিল আমার পাতে। আমি লজ্জায় মরণ কামনা করতে লাগলাম। এক হেঁসেলে দুরকম ভাত এর আগে আর দেখিনি কখনও। মামারা চিরকাল বড় শহরে থাকেন, তাই গ্রামেও তাঁদের বাড়ীর হালচাল বড় শহরের মতো।

রাতে বাইরের লোকদের সংগে কোনোমতে খাওয়াটা শেষ ক'রে মশা আর ছাড়পোকার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। জেলখানায় থাকতে এ অভ্যাস আমার ভালমতেই হয়ে গেছিল। চাঁপামাসীমা কিরকম কে জানে, হয়তো বড়মামীমা কি প্রভাদির মতোই ভীষণ রাগী, তাঁর কাছে গিয়ে মশারি চাওয়া ভাবতেও ভয় হ'ল আমার। অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেংগে গেল কিসের একটা শব্দে। চেয়ে দেখলাম পাশের ঘর থেকে দরজাটা খুলে একটা মশারি হাতে আমার খাটের কাছে এল দুপুরবেলার সেই সুন্দর ছিপছিপে মেয়েটি। মশারিটা বেশ ক'রে টাংগিয়ে চারদিকে গুঁজে দিয়ে আলোটা নিবিয়ে আবার চলে গেল নিঃশব্দে।

এই ভীষণ পুরীতেও আমার কথা কেউ ভাবে দেখে আমার মন থেকে অনেকটা গ্লানি মুছে গেল। এই দুর্ভাগা মেয়েটার জন্য একটু কষ্টও হ'ল। কে এই মেয়েটি, সন্ধ্যা-বৌদির বোন নয়তো? হয়তো সন্ধ্যা-বৌদিই আড়ালে থেকে তাকে দিয়ে করাচ্ছেন এসব কাজ। তাঁর স্বামী আমার সোনামামীমার

ছেলে শৈলদা যে আমাকে ছেলেবেলাতে খুব ভালবাসতেন সেকথা নিশ্চয়ই তিনি জানতে পেরেছেন কারও কাছ থেকে। সন্ধ্যা-সৌদিন জন্যও বড় কষ্ট হ'ল আমার। শৈলেনদা ভালভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেও আজ পর্যন্ত কোনো চাকরি জোটাতে পারেননি, তাই তিনি এসে এই সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন।

পরদিন দুপুরবেলা স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম ভর্তি হওয়ার খোঁজ খবর নিতে। বড় খারাপ হয়ে গেল মনটা। হাইস্কুলকে একদিন বর্জন করেছিলাম গোলামখানা ব'লে, কোন্ মুখে আবার গিয়ে ভর্তি হব সেখানে? অথচ না ভর্তি হয়েও কিছু করার উপায় নেই, উপাধিহীন গুণকে জেনে শুনেও আমল দেয় না কেউ। স্বদেশী নেতা আর মিশনের সন্ন্যাসীদেরও নজর পড়ে থাকে সরকারী উপাধির ওপর।

বারীন এসে বলল, চল্ বাগীচায় যাই, আমাদের চাকর আক্রকালি পাখীর খাঁচা বানাচ্ছে দেখি গে।

আমি স্কুলে যাচ্ছি।

স্কুল আজ বন্ধ।

একজন ছাত্র যে বলল খোলা।

তা পরে যাবি. চল্ ওখানে বসে একটু গল্প করিগে।

বারীনের কথায় খুব ভাল লাগল আমার মনটা। এত বড়লোকের বাড়ীর ছেলে আমাকে ডাকছে গল্প করতে এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কি হতে পারে। আমি তার সংগে

বাগীচায় গিয়ে আশ্রফ লির কাছে বসলাম। বারীন একটা সিগারেট দিতে দিতে আমাকে বলল, খা।

বাঃ সিগারেট কেন খাব?

দূর শালা গেঁয়ো, বাপের জন্মে এটিকেট শিখিসনি নাকি?

ভদ্রলোকের মুখেব এরকম গালি শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম, আমি এখন যাই। সে বলল, কোথায়?

স্কুলে।

আগে তিনজনে একটু তাস খেলে নিই, পরে যাবি।

না, আমি তাস খেলব না।

তারপর বারীন মুখটা বিকৃত ক'রে বলল, দেখলি আশ্রফালি, শালার কাণ্ডটা দেখলি? ব'লেই তারা দুজনে দুটা সিগারেট মুখে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। হঠাৎ তাদের চোখ ঘুরে গেল অন্যদিকে। কি একটা দেখে যেন তারা খুব উল্লসিত হয়ে কিসব বলতে লাগল। কিছু বুঝতে না পে'রে তারা যেদিকে চেয়েছিল সেদিকটাতে ভাল ক'রে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম বাড়ীর মেয়েরা সব বসে আছে পাশের খিড়কি পুকুরটার ঘাটে। তাঁদের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে কথা বলছে আমাদের ঝির সদ্যবিবাহিতা মেয়েটি। স্বাস্থ্যবতী তরুণী নবজীবনের আনন্দ-আবেশে হেসে খেলে হেলে দুলে বর্ণনা করছে তার নতুন শ্বশুরবাড়ীর কতসব অভিনব কাহিনী। তারই লীলায়িত হিন্দোলিত দেহটাকে নিয়ে সরস আলোচনা করতে করতে উদ্গ্রীব আহ্লাদে মেতে উঠল বারীন

তাঁর আশ্রফালি। আমার হাতটাতে একটা টান মেরে বারীন বলল, বোকার মতো তাকিয়ে রয়েছিস্ কেন, ঐ ছাখ্।

কি ?

দেখতে পাচ্ছিস্ নে কি রকম করছে !

এই যে আমারও আছে, বলতে বলতে আমার হাতের মাস্‌লটা ফুলিয়ে দেখালাম। বারীন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, আহাম্মক। আশ্রফালি সকরুণ হাসি হেসে বলল, তোমার বুদ্ধি হবে কি আর মরলে ?

আমার ভাল লাগল না এখানে। আবার স্কুলে রওনা হলাম। বারীন রেগে বলল সিগারেটের কথা বলিস্‌নে কাউকে।

বলব না।

স্কুলে কেউ আমার কথা জিগ্গেস করলে বলবি অসুখ করেছে, আর বাড়ীতে কেউ জিগ্গেস করলে বলবি আমাদের ক্লাসটা আজ ছুটি।

মিথ্যে কথা বলব না আমি।

তোর বাবা বলবে, না বললে গাট্টা খাবি।

স্থাশনেল স্কুলে আমি ছিলাম খুব জোয়ান আর সাহসী। শিক্ষকরা আমাকে বলতেন 'শ্রীকান্ত'-র ইন্দ্রনাথ। ছাত্ররা বলত গামা। গুণ্ডা ছেলেরাও সন্ত্রস্ত থাকত আমার ভয়ে। ফুটবলা ঠিকমতো খেতে পেলে নাকি বাংলার নাম রাখতাম আমি। বারীনদের দুজনকে আমি একাই মেরে শেষ করতে পারি। তবু বিপাকে প'ড়ে সবই সইতে হয় আমাকে।

রাজগাঁ হাইস্কুলের কাছে গিয়ে পড়লাম আরেক মুস্কিলে। বিরাট স্কুল, বিপুল আড়ম্বর, কোথায় গিয়ে কার সংগে কথা বলব বুঝতে পারলাম না কিছু। আফিসের কাছে যেতেই দ্বারোয়ান দিল এক ধমক, ভাগো ইহাঁসে। আমি সভয়ে বললাম, হেডমাষ্টারবাবুর সংগে দেখা করতে চাই।

দেখা হবে না বড়সাহেবের সাথ।

আমার বড় ঠেকা, একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন দয়া ক'রে।

আপনার নাম কি আছে ?

সমীরকুমার রায়।

আচ্ছা আসুন আমার সাথে।

আমি শিক্ষকদের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন শিক্ষক ছুটে এলেন আমার দিকে। আমি ভীত চকিত হয়ে থেমে গেলাম। তিনি সানন্দে আমাকে বললেন, সমীর ! আমার জেলখানার শিক্ষক প্রবোধ চক্রবর্তীকে চিনতে পেরে আমিও সানন্দে বললাম, প্রবোধদা ! তিনি বললেন, তুমি এখানে ?

ভর্তি হব।

কোন ক্লাসে ?

ক্লাস টেন্-এ নইলে নাইন্-এ।

সার্টিফিকেট আছে ?

না।

তাহলে পরীক্ষা দিতে হবে।

কবে দিতে হবে ?

হেডমাষ্টারবাবুর সংগে আলাপ ক'রে বলব। তুমি এখানে থাক কোন্ বাড়ী?

বিশ্বাসবাড়ী।

বিশ্বাসবাড়ী যে আমি রোজই যাই পড়াতে।

কাকে পড়াতে?

প্রভাকে। সন্ধ্যাকে তার বিয়ের আগে পড়াতাম, সে চেনাতেই প্রথম বিশ্বাসবাড়ী যাই, তারপর প্রভাকে পড়াতে শুরু করি। এখন প্রভা বলছে বোর্ডিং ছেড়ে ওদের বাড়ী গিয়ে থাকতে, তাহলে ওর লেখাপড়ার অনেক সুবিধা হবে।

আপনি যাবেন না?

বোধহয় যাব, প্রভার ভিতরে ক্ষমতা আছে, একটু যত্ন নিলেই ওকে বড় লেখিকা ক'রে তোলা যাবে।

বাড়ী ফিরতে প্রথমে দেখা হ'ল মারমুখী বড়মামীমার সংগে। কি-সব কাজ করানোর জন্য আমাকে খুঁজে না পেয়ে চ'টে আগুন হয়েছিলেন, আমাকে দেখামাত্রই মারতে উদ্যত হলেন। আমাকে রক্ষা করল কালকের সে মেয়েটি। বালিকাবিদ্যালয়ের দিক থেকে বাড়ী যাচ্ছিল, আমাকে বলল, বাড়ী চলো। আমি বললাম, পরে যাব।

পাছে চাঁপামাসীমার সংগে দেখা হয়ে যায় সে ভয়ে একটু আঁধার না হলে আমি ঘরে যেতাম না। একে বড়লোকের মেয়ে, তাতে আবার লেখাপড়া জানা, হয়তো আবার কিছু ব'লে বসবে। কিন্তু মেয়েটি আবার আমাকে বলল, ঘরে

চলো। অগত্যা আমি ঘরে ফিরে এলাম তার সংগে। আমাকে রেখে সে চলে গেল। আমি একা ব'সে ব'সে একমনে শুধু প্রার্থনা করতে লাগলাম, ভগবান, বাড়ীর কোনো মানুষের সংগে দেখা না হয় যেন। আমি বাইরের লোকদের সংগে ব'সে খাব, কিছুতেই বাড়ীর লোকেদের কাছে যাব না।

একটু পরে মেয়েটি আবার এল আমার ঘরে। তার এক হাতে খাবারটা, আরেক হাতে একগ্লাস জল। আমার সামনে রেখে বলল, খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। খুব খিদে পেলেও আমি খেতে দ্বিধা করলাম। মনে হ'ল যেন সে লুকিয়ে আমার খাবারটা এনেছে, ধরা পড়লে তার এবং সন্ধ্যাবৌদির দুজনেরই দুর্গতির আর অন্ত থাকবে না। সে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও; পড়ার সময় হ'ল।

তুমি যে আমাকে খাবার এনে দাও, কেউ যদি কিছু বলে?

কে আবার কি বলবে? তুমি খাওয়া শেষ কর তাড়াতাড়ি, তারপর আমাকে পড়াবে।

কি পড় তুমি?

পড়বার সময় বই দেখলেই বুঝবে।

মেয়েটি অন্য ঘরে চলে গেল। আমি খেতে খেতে ভাবলাম খুব ভাল ক'রে পড়াব তাকে, গরিবের মেয়ে, একটু লেখাপড়া শিখলে স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে পারবে। আজ এরা দুঃস্থ হ'লেও এককালে ছিল বিশেষ সুসমৃদ্ধ। ঐ যে ফিরে আসছে সে। ও বাবা, তার হাতে যে অনেক মোটা

মোটা বই খাতা ! সেগুলি টেবিলের ওপর রেখে সে বলল, আজ থেকে তুমি আমার মাষ্টার, আমি তোমার ছাত্রী। আমাকে তুমি ডাকবে চাঁপামাসীমা। —অ্যাঁঃ !

পরদিন প্রবোধদা বোর্ডিং ছেড়ে চ'লে এলেন আমাদের এখানে। স্নেহে ঔদার্যে শক্তিতে সাহসে জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রভাদির মতো শিক্ষিতা দর্পিতা মেয়েও তাঁর সমুখে হয়ে যান কত শান্ত স্নিগ্ধ অমায়িক সেবাপরায়ণা। কে জানে বিধির কোন্ খেয়ালে মহাবিপ্লবীর মিলন হ'ল ধনীকন্যার সংগে। যদিও প্রবোধদা বাড়ীর অন্যদিকে থাকেন ব'লে আমার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না তাঁর সংগে, তবুও একটা গভীর তৃপ্তি ও আশায় সঞ্জীবিত হয়ে থাকে আমার হৃদয়, প্রশমিত হয়ে যায় আমার অসহায় ভাবটা।

বাড়ীর অন্যান্যরাও প্রবোধদাকে একটা আনন্দের অবলম্বন স্বরূপ পেলেন। সবার হালচালের মধ্যে একটা সুন্দর পরিবর্তন এল। সন্ধ্যা-বৌদি চাঁপামাসীমা একটা নবীন উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। প্রভাদির তো কথাই নেই, মহামহিমান্বিত একটা আমূল উন্নয়ন সংঘটিত হ'ল তাঁর মধ্যে। প্রবোধদাকে যেন তিনি দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। আবার প্রবোধদাও প্রভাদির কল্যাণের জন্য কায়োমনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করলেন। আমার বড় ভাল লাগল পাষাণ দেবতার অন্তরের এই মধুময় আকুলতা দেখে।

প্রবোধদাবই নির্দেশমতো আমি গিয়ে একদিন স্কুলের হেডমাষ্টারের সংগে দেখা করলাম। তিনি স্বয়ং আমার যোগ্যতা পরীক্ষা করলেন। আমার উত্তর দেখে আমাকে ভর্তি ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, দাতুর দেয়ো বৃত্তিটাও আমি না চাইতেই আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু বাঘের ভয় যেখানে সন্ধ্যাও হয় সেখানে, আজও বাড়ী ঢোকার পথে দেখা হ'ল বড়মামীমার সংগে। আমি ফ্রি পড়ার অনুমতি পেয়েছি এ-খবরটা ইতিমধ্যে এসে গেছে তাঁর কানে। আমাকে কাছে পাওয়া মাত্র রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি আমার কাণ ধরে বললেন, ছোটলোক, বাড়ীতে থাকতে দিয়েছি ব'লে এখন স্পর্ধা বেড়ে গেছে, দাঁড়া তোকে ফ্রী পড়ার মজাটা দেখাচ্ছি। প্রবোধবাবু শহর থেকে ফিরলেই চিঠি দেব স্কুলে। আমি সভয়ে বললাম, আমি কিছু বলিনি, হেডমাষ্টারবাবু অমনি দিয়েছেন।

ফের মিথ্যেকথা, আজ ছুটির দিন স্কুলে গেছিলি কেন?

আজ স্কুল খোলা আছে, বড়মামীমা।

ক্রুদ্ধ হয়ে বড়মামীমা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন মেয়েস্কুলের দিকে। পথের পাশে বসে বাবীন একটা বই পড়ছিল, তাকে ডেকে বললেন, স্কুলে যাওনি কেন তুমি?

সে বলল, আজ আমাদের ছুটি।

না, আজ স্কুল খোলা।

কে বলেছে?

সমীর এল স্কুল থেকে।

ও-শালা বলেছে! ব'লেই বারীন উঠে এক ঘুসি মারল আমাকে। আমি চুপ করে রইলাম। বড়মামীমা বললেন, বল ছুটি কি না? বারীন বলল, সমি, ভুল খবর পেয়ে স্কুল কামাই করে ফেলেছি।

তোমাকে প্রায়ই এখানে ব'সে সময় নষ্ট করতে দেখি।

সময়টা নষ্ট করিনি, একটা ফেমাস্ বই পড়ে ফেলেছি।

প্রভাদি সে-পথ দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ী চলেছিলেন, এসে বারীনকে বললেন, এক্স্‌কিউজ্ মি, বইটা দেখতে পারি কি? সে বললে, দেখতে হবে না, খুব নাম করা বই।

প্রভাদি বললেন, তুমি কতটুকু বোঝ কোন্‌টা ভাল বই?

তোমার চেয়ে ভাল বুঝি।

এক কলম লিখতে পার না, বড় কথা বলতে লজ্জা হয় না?

প্রবোধদা সংগে থাকলে অমন লেখা সবাই লিখতে পারে।

যা বোঝ না তার মধ্যে নাক ঢোকাতে এসো না।

তুমি বোঝ ঘণ্টা।

তুমি এখানে বসে থাক স্কুলের মেয়েদের টিজ করতে।

তুমি স্বদেশীওলাদের দলে যোগ দিয়ে ছেলেদের সংগে ফ্লার্ট ক'রে বেড়াতে, তাই অন্যকেও ভাব তোমার মতো।

অসভ্য কোথাকার মুখ সামলে কথা বলবি।

তুই বিলাতে কত ছেলেদের মাথা খেয়েছিস্ জানিনে? হারামজাদা লোফার স্কাউণ্ড্রেল!

হারামজাদী বিচ ফ্লার্ট।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। একি হ'ল, একি হ'ল! সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্বকাম্য শালীনতা শীলতার এমন হত্যাদৃশ্যে মন আমার ব্যথায় মুচড়ে উঠল। বড়মাসীমা বললেন, প্রভা, তুমি লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ। রাগে আগুন হয়ে প্রভাদি বললেন, ছেলের বদমায়েসিকে সাপোর্ট ক'রে ক'রে মাথাটি তার খেয়ে বসেছ তুমি। বারীন বলল, হারামজাদি তুই ছেলে হান্ট করে বেড়াস্, আবার বদমায়েস্ বলিস্ আমাকে!

তবে রে স্কাউণ্ড্রেল! বলেই প্রভাদি একটা চাপড় মারলেন বারীনের মুখে। অমনি বারীনও প্রাণপণে প্রভাদির চুলগুলি ধ'রে ঝাঁকাতে লাগল। আমি খানিক হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম প্রবোধদার প্রিয়জনের এমন অবমাননা দেখে। এখনই যদি তিনি এখানে এসে পড়েন তাহলে কি ভাববেন। আর স্কুলের সব অশিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা যদি এসে দেখে ফেলে অভিজাত পরিবারের এই কাণ্ডটা তাহলে মুখ দেখাবারও উপায় থাকবে না আমাদের! মনে পড়ল আমার দারিদ্র্য-নিপীড়িতা সরকার-লাঞ্ছিতা মায়ের কথা। তাঁর মুখ থেকে সহস্র উত্তেজনায়ও বেরোত না একটিও ভদ্রতাবিবর্জিত কথা। তিনি বলতেন, অন্যকে গালি দেওয়ার জন্য নিজেকে তো আর ছোট করতে পারিনে চিরজন্মের মতো।

আমার অন্তরের মধ্যে একটা অনুশোচনা হতে লাগল এই ভেবে যে আমার দোষেই এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল।

যেচে এসে আনের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করার চেয়ে যে মরে যাওয়াও ছিল ভাল। আর কত বড় ক্ষতি আমি করলাম আমার চিরশুভার্থী প্রবোধদার! প্রভাদি নিশ্চয়ই আগের মতোই ভাল আছেন, তবু আমার দোষে মুহূর্তের উত্তেজনায় যে নোংরামিটা বেরিয়ে পড়ল তাঁর ভিতর থেকে সেকথা প্রবোধদার কানে গেলে কি একটা চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে থাকবে না তাঁর হৃদয়ের মধ্যে! কত উঁচু ধারণা তিনি পোষণ করেন প্রভাদি সম্বন্ধে!

বড়মামীমা বললেন, প্রভা, বড় সেমলেস্ হয়ে গেছ তুমি। প্রভাদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন তুমি ছেলের দোষ একটুও দেখ না। চল বাড়ী চলে যাই। বড়মামীমা রাবীনকে বললেন, চলো, বাড়ী চলো।

না, আমি এখন যাব না, বইটা শেষ ক'রে তবে যাব।

বাড়ীতে গিয়ে শেষ করা যায় না?

না, যায় না। মুড নষ্ট হয়ে গেলে পড়া যায় না।

এখানে স্কুল ছুটি হওয়ার সময় ছেলেদের বসা বারণ।

কিছু বারণ নয়, তুমি যাও।

তাহলে প্রভা ঠিকই বলেছে তুই স্কুল কামাই ক'রে মেয়েদের টিজ করার জন্য ব'সে থাকিস্ এখানে?

তুই বাজে বকিস্ নে, চলে যা এখান থেকে।

বড়মামীমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, অসভ্য রাসকেল! রাবীন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, মাগী আনকালচার্ড্, বাপের জন্মে

এটিকেট শিখিস্নি। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম এ দৃশ্যটা যেন কারও চোখে না পড়ে। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন। স্কুল থেকে চাঁপামাসীমাকে আসতে দেখে বারীন চলে গেল। চাঁপামাসীমা আমাকে বললেন, বাড়ী চলো, খাবে।

তিন

রাজগা হাইস্কুলে যে শুধু জাঁকজমকই ছিল তা নয়, অনেক ভাল ভাল ছাত্রও ছিল সেখানে। তবে বড় অহংকারী তারা। প্রথম দিন আমার সংগে কথা বলা দূরে থাক, মানুষ ব'লেও আমল দিল না আমাকে। ভয়ে ভয়ে আমি গিয়ে সবার পিছনের বেঞ্চিটাতে বসলাম। সেখানেই আমার পরিচয় হ'ল ক্লাশের সব চেয়ে ঢ্যাংগা ও খারাপ ছাত্র গৌরাংগের সংগে।

একদিন গৌরদা আমার হাতে একটা হাতে-লেখা মোটা বই দিয়ে বলল, নে। টাকার অভাবে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বই আমি কিনতে পারছিলাম না সেকথা কি ক'রে টের পেয়ে সমস্ত বইটা সে নকল ক'রে ফেলেছে আমার জন্য। এমন সহজ অনাড়ম্বর শ্রমশীল পথে যে এমন সুগভীর সুবিপুল পরোপকার করতে পারা যায় তা আজই প্রথম টের পেলাম। মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে রইলাম এই উপেক্ষিত ধিকৃত লোকটার মেঘাবৃত মহিমার দিকে।

একদিন খবর পেলাম সারা বাংলাদেশে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে। গৌরদারই সনির্বন্ধ অনুপ্রেরণায় ও চাঁপাদামীমার সেবাস্নিগ্ধ প্রযত্নে আমি একটা প্রবন্ধ লিখে হেডমাষ্টারবাবুর কাছে দিলাম। তিনি সেটা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতাতে। তাঁর প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ল সারা স্কুলে। ভাল ছাত্ররাও তখন আমাকে মেনে নিল মানুষ বলে।

কিন্তু এমন আনন্দ আমার অদৃষ্টে বেশীদিন রইল না। আমাদের নীরস দাদুর কঠিন প্রাণে তিনটি মাত্র শখ ছিল — বাগান, লাইব্রেরী, পুকুর। আমাদের পুকুরগুলি ছিল খুব বড়, বাঁধানো, সুন্দর। একটা ছিল তারমধ্যে সেরা। বড় মাছ ছাড়া হয়েছিল তাতে। কিছুদিন থেকে একটা গোসাপ এসে মাছ খেয়ে যাচ্ছিল শ্মশান থেকে। বহু লোক বহু চেষ্টা করেও সেটাকে না পারল মারতে, না পারল তাড়াতে। আমার জিদ চেপে গেল সে কাজটা সমাধা করতে। স্নানাহার ভুলে একদিন পুকুরপাড়ে বসে রইলাম গোসাপটার জন্য ওঁৎ পেতে। দুপুরবেলা সবাই যখন বিশ্রামরত তখন সেটা এসে পুকুরে ডুব দিল। আমি একটা লম্বা বাঁশ নিয়ে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরতে লাগলাম, দম নিতে মাথা তুললেই মারব বাড়ি। সে এক কঠিন কাজ। গোসাপটা মাথা তুলল পূব ধারে। আমি অনেক কষ্টে লুকিয়ে গেলাম সেখানে। সংগে সংগে সেও টুপ করে নামল ডুব। আবার গিয়ে উঠল আরেক ধারে। আমিও আবার চুপিচুপি গেলাম সেখানে। সেও

আবার অমনি মারল ডুব। আমি তার দিকে গেলেই সে চলে যায় আরেক দিকে। চার ঘণ্টা এরকম [illegible] হয়রানির পর একটা বাড়ি দিতে পারলাম সাপটার মাথায়। প্রায় সংগে সংগেই সে ভেসে উঠল জলে। খবর পেয়ে বাড়ীর সবাই খুশীতে কোলাহল করতে করতে ছুটে এল পুকুরঘাটে। সবাই সে বিরাট গোসাপটাকে দেখে আর আমার প্রশংসা করে।

সবার দেখা শেষ হয়ে গেলে সমস্যা হ'ল এটাকে ফেলি কোথায়। যেখানেই ফেলব সেখান থেকেই যে দুর্গন্ধে ছেয়ে ফেলবে চারদিকের সব পথঘাট। মনে পড়ে গেল বারুই মহিম ভাওয়ালের কথা। সে সেদিন হেড মাস্টারের কাছে মিছিমিছি নালিশ করে বারীনকে খুব বকুনি খাইয়েছিল। বারীন এসে আমার শরণাপন্ন হয়ে বলেছিল, কি করা যায়? আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম এর প্রতিশোধ নেবই নেব। এখন চুপিচুপি সাপটা নিয়ে চলে গেলাম মহিম ভাওয়ালের পানের বরোজের মধ্যে। দরজার ঠিক ভিতরেই হাত পা ছড়ানো অবস্থায় তাকে লম্বা-লম্বি ক'রে টাংগিয়ে রাখলাম যেন মহিম ভাওয়াল ঢোকার সময় দরজা খোলার সংগে সংগেই হঠাৎ সেটাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। বিরাট অন্ধকারাচ্ছন্ন লতাচ্ছাদিত নির্জন বরোজটাতে এই রাক্ষসের মতো প্রাণীর মড়াটাকে হঠাৎ দেখে তার মনের অবস্থা কি হবে তা ভেবে আমি খুব খুশী হয়ে উঠলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে একটা বিকট চীৎকার শুনে বহুলোক ছুটোছুটি করে

গেল মহিম ভাওয়ালের বরোজের দিকে। আমিও গেলাম। মাটিতে পড়ে আছে মহিম ভাওয়ালের ছেলেটা, যন্ত্রণায় যেন কেমন কাৎড়াচ্ছে আর আবোল তাবোল কিসব বকছে। লোকে তাকে কত বোঝাচ্ছে এটা মরা সাপ, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। নির্দোষ ছেলেটার লাঞ্ছনা দেখে বড় কষ্ট হ'ল আমার। অনেক যত্ন চেষ্টার পর ভাল ক'রে তুললাম তাকে। বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম বড়মামীমা দাদুকে বলছেন এটা নিশ্চয়ই আমার কাজ। দাদু অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে জিগগেস করলেন, সাপটা তুই বরোর মধ্যে টাংগিয়েছিলি? আমি যে টাংগিয়েছি তা কেউ দেখেওনি শোনেওনি সুতরাং একবার 'না' বললেই চুকে যায় সব ল্যাঠা, তবু আমি পারলাম না মিথ্যা কথা বলতে। আমার মায়ের ছবিখানি ভেসে উঠল মনের মধ্যে, যেন আগেরই মতো বলছেন, মিথ্যেকথা যে বলে সে কোনদিনও পারে না কোন বড় কাজ করতে। আমি দোষ স্বীকার করতেই দাদু আমাকে অনেকক্ষণ চাবকালেন, তারপর না খেতে দিয়ে আমার ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলেন।

সারাদিন উপবাসী থেকে কেবলি ভাবতে লাগলাম, বাড়ীর সবাই হয়তো ছি ছি করছে আমাকে, এ মুখ আর আমি তাদের সামনে বার করব কি করে? প্রবোধদা কি বলবেন? চাঁপামাসীমা কি ভাববেন? না, না, এখানে আর থাকা চলবে না আমার, যে দিকে হয় চলে যাব কোথাও। রাত্রি হলে শুয়ে পড়লাম। অন্যান্য দিন বালিশে মাথা রাখলেই আমি ঘুমিয়ে

পড়ি, আজ ঘুম এল না কিছুতেই। তবু পড়ে রইলাম চোখ বুজে। কোথায় চলে গেছে আমার কয়দিনের আনন্দ স্রোত।

কিছুক্ষণ পর চাঁপামাসীমা এলেন। আমাকে ঘুমন্ত দেখে মশারিটা টাংগিয়ে ধারগুলি বেশ ক'রে গুঁজে দিলে তারপর যথারীতি পড়তে বসলেন। ছেলেমানুষের মতো দুলে দুলে ব'লে ব'লে পড়তে লাগলেন। আমার চেয়ে তিনি দু'তিন বছরের বড়, কিন্তু তাঁকে মনে হয় আমার চেয়ে অনেক ছোট। পড়তে বসলে মনে হয় আরও ছোট। দেখতে বড় ভাল লাগে আমার। অন্যের কাছে তাঁকে মনে হয় কত প্রবীণ, কিন্তু নিজের কাছে তিনি হয়ে থাকেন কতই না ছেলেমানুষ। মাসীমা কখনও পড়েন, কখনও লিখেন, কখনও বা গুণগুণিয়ে একটু গান করেন, 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস, সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস'। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আমি শুনি।

রাত্রির কাজকর্ম সেরে শুতে যাবার আগে মেজমামীমা এলেন আমার ঘরে, হাতে তাঁর থালা বাটি গ্লাস। সেগুলি নীচে রেখে তিনি মাসীমাকে বললেন, সমীর জাগলে পরে ওকে খেতে দিয়ে তুই শুতে যাবি।

কুম্ভকর্ণের ঘুম কখন ভাংগবে, ততক্ষণ জেগে বসে থাকব?

হাঁ, একটু কষ্ট কর্‌, ও একটা বড় মানুষ হবে।

মাসীমা জিগগেস করলেন, রাত্রে যদি ঘুম না ভাংগে? মেজমামীমা বললেন, পেটুক মানুষ না খেয়ে ঘুমিয়েছে, জাগতে

বেশীক্ষণ লাগবে না। ওর মা বলতেন অসুখের সময় সবাই মরে শরীরের জ্বালায় আর ও মরে খিদের জ্বালায়।

ওর মা খুব ভাল মানুষ নাকি, মেজদি?

বাংগাদি যে কত ভাল মানুষ তা আর বলে শেষ করা যায় না, ব'লে মেজমামীমা শুতে চলে গেলেন। মাসীমা আবার পড়তে লাগলেন। আমার মনটা এত দুঃখের মধ্যেও শান্তিতে ভরে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ভাবতে লাগলাম মেজমামীমার কথা, কিক'রে শত সহস্র কাজের ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমার মতো একটা বাইরের লোকের খবর রাখলেন? মাসীমার মতো মহিমাময়ী মহিলাই বা আমাকে এত স্নেহ করেন কি জন্য?

একটা ভীষণ উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছি কোন্ এক অন্ধকার অতল গর্ভে। ধরতে চাই, কিছুই পাইনে ধরার মতো। মরণের মুখ হা ক'রে ওই যে চেয়ে আছে আমাকে গিলবে। হুহু করে গিয়ে পড়ব হয় পাথরের ওপর নয়তো সমুদ্রের ভিতর। পা-দুটি অবশ হয়ে গেছে, কিছুতেই পাহাড়ের গায়ে খাড়া থাকতে পারছে না। মা মা ব'লে ডাকতে লাগলাম আকুল হয়ে। অমনি কোথা থেকে মা এসে ধরে ফেললেন আমাকে। অজস্র আদরে অভিষিক্ত করে দিলেন আমার চোখ মুখ। আমি সানন্দে চাইলাম তাঁকে ধরতে। কিন্তু কোথায় মা? ঘুম ভেংগে গেল। কে যেন সরিয়ে নিল তার হাতটা।

আমি মাথাটা তুলতেই মাসীমা উঠে বসে সস্নেহে বললেন, খিদে পেয়েছে, খাবে চলো। আমার খুব খিদে পেয়েছিল, এক লাফে খাট থেকে নেমে বসে গেলাম খেতে। মাসীমা খাবারটা এগিয়ে আমার সম্মুখে দিতেই গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। আজকাল মাসীমার সম্মুখে বসে খেতে আর লজ্জা করে না। তিনি সস্নেহে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, আমি আপনমনে নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ, সমীর ?

কেন ?

তোমার কাছে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ব'লে ?

তুমি কি রাগ কর নাকি তোমার কাছে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে ?

তুমি যে ঘৃণা কর মেয়েদের।

বাঃ একজন আবার ঘৃণা করে নাকি আরেকজনকে ?

আমি তোমার কাছে থাকলে তুমি একটুও বিরক্ত হও না ?

নাঃ, তুমি থাকলে আমার আরও ভাল লাগে।

বাজে কথা।

আমার বাইরের রুক্ষতা দেখে মানুষে বোধহয় মনে করে ভিতরেও নেই কোনো মমতা ভদ্রতা। তাই মাসীমাও বিশ্বাস করলেন না যে তিনি কাছে থাকলে আমার লেখাপড়া করতে খুব ভাল লাগে। আমার কল্যাণের জন্য আমি যা-কিছু করি নে কেন তার মধ্যেই মাসীমার এমন একটা নিবিড় মধুর আগ্রহ প্রকাশ পায় যে সে-কাজটা করতে আর কোনো

ক্লান্তিই বোধ হয় না আমার। মাসীমাকে খুশী করার জন্য সে কাজ করতে বরং আমার উৎসাহ আনন্দের আর অন্ত থাকে না। একদিন তিনি না থাকলে কেমন একটা খালি খালি লাগে চারদিক; মনে হয় আমার যেন আর কোনো আপনজন নেই কোনোখানে।

সকালবেলা মাসীমা যথাসময়ে এসে আমার পাশে পড়তে বসলেন। আজ তাঁকে অন্যদিনের চেয়েও ভাল লাগল। চোখদুটি তাঁর আরও তন্ময়, মুখখানি আরও দীপ্ত স্নিগ্ধ। পড়তে পড়তে তিনি মুখ তুলে বললেন, প্রভার জেদটা বড্ড বেশী, যখন যা চাইবে তখনি তা পাওয়া চাই। আমি জিগগেস করলাম, আবার কি জেদ ধরলেন?

প্রবোধদার এক বন্ধু মিষ্টার সান্যাল বিলাত আমেরিকার ডিগ্রীওলা বিদ্বান। খুব বড় সরকারী চাকুরে, হাজার টাকার ওপরে মাইনে, মার্ক্সিষ্ট-সাম্যবাদী দলের একজন বড় নেতা।

সরকারী কর্মচারী আবার নেতা কিরকম?

অতি গোপনে তিনি তাঁদের নেতৃত্ব করেন। মার্ক্সিজম্ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুব বেশী। প্রভা সেকথা শুনে প্রবোধদাকে বলছে সান্যালকে শহরে গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এখানে আনতে।

মার্ক্সিজম্ তো তিনি প্রবোধদার কাছ থেকেই শিখতে পারেন।

মার্ক্সিজম্ শেখার চেয়ে বরং বড়-অফিসার দেখার শখটাই প্রভার বেশী। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে, চিরকাল দেখে এসেছে বড়-অফিসারকে পূজো করতে।

প্রবোধদা এর বিপরীত, পরাধীনতার অনুচর সরকারী কর্মচারীগুলিকে তিনি ঘৃণা করেন।

তবু প্রভা তাকে অনুরোধ করছে সান্ন্যালের কাছে যেতে।

প্রবোধদা কি বললেন ?

বললেন মার্ক্সিষ্ট সাম্যবাদীদের কাজকর্ম পছন্দ করেন না।

কেন, প্রবোধদা তো সাম্যবাদী ?

তারা নাকি ভারতীয় সাম্যবাদীদের বিদেশীর অন্ধ অনুচর করে রাখতে চায়। ১৯২৫ সনে কানপুর কনফারেন্সে সাম্যবাদী নেতা সত্যভক্ত এই নীতির প্রতিবাদ করাতে তাঁকে বের করে দেয় দল থেকে। প্রবোধদা উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

কিন্তু প্রবোধদাও তো রাশিয়ার পরম ভক্ত ?

তাতেই তো তিনি আরও দুঃখীত। এরা নাকি সাম্যবাদ আর রাশিয়া দুয়েরই শত্রু। রাশিয়ার সহানুভূতি এবং সহায়তাকে ব্যবহার করছে ইংরেজ রাজত্ব রক্ষার জন্য।

প্রবোধদার মতো গোঁড়া কম্যুনিষ্ট একথা বলেন শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। চাঁপামাসীমা আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কম্যুনিজম্‌টা একটু বুঝিয়ে দাও, সমীর। আমি বললাম, আমি বোঝাব কিক'রে, আমার কি সে বিদ্যে আছে ?

নিশ্চয়ই আছে, নইলে সে প্রবন্ধটা লিখলে কিক'রে ? সেটা পড়িয়ে দাও তবেই হবে।

পড়লেই তো পার।

পড়েছি, বুঝতে পারিনি কিছুই।

আমি বললাম, আজ আমার সময় নেই। তিনি বললেন, বেশ, কাল পড়বে। আমি বললাম, কালও না, পরশু পড়ব।

কিন্তু পরশু যে আমি পড়ব না।

কেন ?

শিবরাত্রিব উপোস পরশু।

তা পড়বে না কেন ?

মাসীমা বললেন, উপোস তো করনি, করলে বুঝতে। আমি বললাম, বেশ, আমি করব শিবরাত্রির উপোস। তিনি ভয়ে চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে। পরক্ষণেই আবার অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, পাগল! আমি বললাম, উপোস আমি করবই। তিনি বললেন, তুমি তো নাস্তিক, ভগবান ঠাকুর দেবতা কিছুই মান না, তবে কেন মিছিমিছি উপোস করতে যাবে ? আমি বললাম, আমি উপোস করব না খেয়ে থাকার জন্য, কোনো বর লাভের জন্য তো নয়, ভগবান ঠাকুর দেবতার সংগে কি সম্পর্ক আমার ?

লক্ষ্মীটি জেদ করো না, উপোসে অসুখ করবে তোমার।

না, করবে না।

বেশ, উপোস করবে, কিন্তু খিদে পেলেই চেয়ে খাবে।

আমি বললাম, তাহলে তুমি না পড়লেও আমার পড়ার কাছে এসে বসে থাকবে। তিনি হেসে বললেন, কেবল দুষ্টুমি ! ব'লেই একটা মৃদু ধাক্কা দিলেন আমার মাথায়।

চার

যথাসময়ে শুরু করলাম শিবরাত্রির উপোস। পড়তেও বসলাম যথারীতি। দিনটা কেটে গেল ভালভাবেই। চাঁপামাসীমা ভেবেছিলেন আমি পারব না উপোস করতে, সেকথা মনে ক'রে বুকটা ফুলে উঠল অহংকারে। তখন আরও বাহাদুরি দেখাতে বিকালবেলা গেলাম মাঠে ফুটবল খেলতে। কায়দা কানুন কম জানতাম ব'লে খেলার সময় আমাকে গায়ের খাটুনিটা খাটতে হ'ত বেশী। খেলার শেষে অবশ হ'য়ে গেল শরীরটা। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে কেমন একটা অসহনীয় অস্বস্তিতে জ্বলতে জ্বলতে পুকুরে গিয়ে গা ধুতে নামলাম। ওপরের জলটা গরম হ'লেও নীচের জলটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা। ডুব দিয়ে নীচে গিয়ে বসতেই দেহটা শান্তিতে ভরে গেল। নির্জলা উপবাসের মধ্যেই প্রাণ ভ'রে জল খেয়ে ভিতরের জ্বালাটা জুড়িয়ে নিলাম!

ঘরে ফিরে এসে বুঝলাম বসে থাকার সাধ্য আমার নেই, শুয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাই। তবু শুধুমাত্র মানের দায়েই বহুকষ্টে যথারীতি রাত্রির পড়া পড়তে বসলাম। কিন্তু মন বসল না পড়ায়। মাসীমাও এলেন না পড়াতে। বুঝলাম তাঁকেও ধরেছে উপোসে। বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে

ধীরে ধীরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম কতক্ষণে রাত্রি ভোর হবে, কতক্ষণে কিছু খেয়ে বাঁচব।

ঘুম ভাংগতেই উঠে স্নান করতে চললাম। তৈরী হয়ে বসে থাকব, ডাকা মাত্র খেতে চলে যাব। অন্যেরা কতক্ষণ আগে উঠে পড়েছে কে জানে। এক ঘুমে যে রাতটা কেটে গেল এজন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এমনসময় ঢংঢং ক'রে বারটা বাজল ঘড়িটাতে। সব উৎসাহ নিবে জল হয়ে গেল আমার। নিরাশ বেদনায় ছটফট্ করতে করতে শুয়ে পড়লাম গিয়ে আবার। অনেকক্ষণ ঘুমালাম। ঘুম ভাংগতেই উঠে গিয়ে আবার দেখলাম ঘড়িটা। একটা বেজেছে মাত্র। আরও কিছুক্ষণ কাটালাম অনেক কষ্টে। শেষে আর পারলাম না। আমার ঘরের উঁচু মাচাটার ওপর অনেক কুল রাখা হয়েছিল। ছেলেপিলেদের ভয়ে মইটা সরিয়ে রাখা হয়েছিল ব'লে দেয়াল বেয়ে কোনোমতে গিয়ে সেখানে উঠে কাঁচা পাকা নির্বিশেষে একদিক থেকে প্রাণ ভরে খেতে লাগলাম সেগুলি।

'খুট্' ক'রে একটা শব্দ হ'ল নীচে। সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে চেয়ে দেখলাম পাশের ঘর থেকে আমার ঘরে আসার দরজাটা খুলে গেল। টেবিলের ওপর নিবুনিবু বাতির আলোটা বেড়ে উঠল। মাসীমা আমার মশারির ধারগুলি ঠিকমতো গোঁজা আছে কিনা দেখলেন। তারপর বাতিটা কমিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কি মনে ক'রে আবার ফিরে এসে বাতিটা বাড়িয়ে আমার বিছানার দিকে তাকালেন।

আমাকে দেখতে না পেয়ে বাইরে যাওয়ার দরজাটার দিকে তাকালেন। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন মুখে ঘরের এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন। দাদুর লাইব্রেরীটা ছিল আমার ঘরে, তার সব আলমারিগুলির পিছনটাও ভাল ক'রে খুঁজে দেখলেন। কোথাও আমাকে না পেয়ে একটা করুণ ভয়ের ছাপ পড়ল তাঁর উদ্‌বিগ্ন মুখখানির ওপর। হঠাৎ তাঁর পায়ের নীচে কি একটা পড়তেই তিনি থমকে গেলেন। সেটাকে তুলে দেখলেন একটা কুলবীচি। অমনি ওপরদিকে তাকালেন। উপায়ান্তর না দেখে আমিও লজ্জায় মরতে মরতে নেমে এলাম নীচে। মাসীমার উপহাসের ভয়ে আমি আর তাকাতে পারলাম না তাঁর মুখের দিকে। কাল কুল খাওয়ার কথা জানাজানি হ'লে আমার কি অবস্থা হবে সে ভয়ে আরও সংকুচিত হয়ে গেলাম।

আশ্চর্য, মাসীমা কোনো ঠাট্টা-তামাসা উপহাস-পরিহাস কিছুই করলেন না। প্রাণ দিয়ে যেন উপলব্ধি করলেন আমার ক্ষুধার মর্মান্তিক জ্বালাটা। একটা বালতিতে ক'রে ঠাণ্ডা জল এনে খুব ভাল ক'রে আমার মাথাটা ধুইয়ে দিলেন। তারপর নিজে নাইতে চলে গেলেন। খুব তাড়াতাড়ি নেয়ে এসে খাবারটা তৈরি ক'রে খেতে দিলেন আমাকে। আমার খাওয়ার সময় স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি শুয়ে পড়লে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘুমালাম তিনি আমার শিয়রে বসে পাখা দিয়ে আমার মাথায় হাওয়া করতে লাগলেন।

শান্ত নিবিড় নিদ্রার শেষে চোখ খুললাম বীণানিন্দিত সংগীত ঝংকারে। মুক্ত বাতায়ন পথে আধো-আলো আধো-ছায়াময় আকাশে নবোদিত উষার অরুণিমার দিকে চেয়ে ধ্যানমগ্না মাসীমা গাইছিলেন—'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, মনের কোণের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে দাও।' হয়তো স্বপ্ন দেখছি মনে ক'রে আরও ভাল ক'রে চাইলাম। স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যি আমার মাসীমা হৃদয়ের আকুল আবেদন জানাচ্ছেন কোন্ এক অপরূপ অনির্বচনীয় দরদীর চরণমূলে। কে সেই মহাজন যাঁর কৃপাকণা যাচঞা করেন আমার দেববাঞ্ছিতা মাসীমাও? তিনি আপনমনে গেয়ে চললেন—'বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।'

ধীরে ধীরে গানখানি শেষ হয়ে গেল। মাসীমারও একটা পরম পবিত্র নূতন রূপ আমার সামনে বিকশিত হয়ে উঠল। মহাবিশ্বের সীমাহীন সত্তার সংগে ব্যক্তিসত্তাকে মিলিয়ে দিতে সংগীতের মতো এমন সহজ সজীব সেতু আর নেই। আপন হৃদয়ের সকল ব্যথা নিঃশেষে উজাড় করে তিনি নিবেদন করলেন তাঁর ধ্যানের ধন পরম-শরণ অসীমের চরণোদ্দেশে। কণ্ঠনিঃসৃত নিবেদনটুকু ভাসতে ভাসতে কাঁপতে কাঁপতে মহাপ্রয়াণ করল অসীমের লক্ষ্যপথে। যেন তাঁর নিঃসহায় ব্যথার করুণ কাহিনীটি দরদ দিয়ে শুনতে অখণ্ড অসীম হৃদয়েশ্বরটি ছাড়া বিশ্ব সংসারে আর কেউ নেই।

আমিই চাঁপামাসীমার একমাত্র শ্রোতা ছিলাম না। ছোটদিদিমাও অন্য ঘরে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন মাসীমার গান শুনে। সংগীতের গুণে সাপও বশ হয়, একথা সত্য। নইলে ছোটদিদিমার মতো সদাবিরক্ত কলহপরায়ণা মানুষও গান শুনতে ভালবাসে একথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল! তিনি তাঁর ঘর থেকে ডেকে চাঁপামাসীমাকে অনুরোধ করলেন আরেকখানি গান গাইতে। আমিও বললাম, আরেকটা গান গাও, মাসীমা। যন্ত্রের সংগে গাওয়া গান আমার ভাল লাগে না ব'লে মাসীমার রেকর্ডে দেওয়া গানগুলি আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। সবাই তাঁর গানের প্রশংসা করলেও আমি নিন্দা না ক'রে পারতাম না। এজন্য মাসীমার একটু অভিমানও ছিল আমার ওপর। এখন আমি বলার সংগে সংগেই আবার তিনি গাইতে লাগলেন—'ভেংগে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে।' মাসীমা যখনই যার জন্য যা করেন তার মধ্যেই থাকে একটা আন্তরিকতা, একটা আপ্রাণতা। তাঁর গানের মধ্যেও ফুটে উঠল সেই ভাবটা। তাঁর দুটি নয়ন বেয়ে অবিরলধারে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

গানখানি শেষ হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাসীমার তন্ময়তার অবসান হ'ল না, অশ্রুর ধারাও ব্যাহত হ'ল না। ধীরে ধীরে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন ঘুম থেকে উঠতে লাগল। এমনসময় গানের টানে আমার বড়মামীমাও এসে উপস্থিত

হলেন আমাদের ঘরে। গানখানির একটু প্রশংসা ক'রে মাসীমাকে বললেন, কাল বুঝি ঐ ঘরে ঘুমিয়েছিলে ?

চাঁপামাসীমার কানে সেকথা গেল কিনা বোঝা গেল না। আগের মতোই অন্যমনস্ক হয়ে তিনি চেয়ে রইলেন বড়মামীমার দিকে। বড়মামীমা বললেন, রাত্রে একটা পেন্সিলের জন্য গেছিলুম তোমার ঘরে, তখন তোমাকে বিছানায় না দেখে কি যে ভয় পেয়েছিলুম। বকুনির ভয়ে আমি উঠে হাত-মুখ ধুতে চলে গেলাম।

পাঁচ

পরদিন দুপুরে কি একটা উপলক্ষে মামাবাড়ীর সবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল জজবাড়ী। আমার মামাদের চেয়েও তারা বেশী ধনী এবং এ্যারিস্টোক্রেট। সবাই সেখানে খেতে গেলেন নানারকম বেশভূষা জাঁকজমক ক'রে। শুধু আমাকে নেওয়া হ'ল না দরিদ্র ব'লে, আর মাসীমা গেলেন না কি একটা জরুরী কাজ করতে হবে বলে। আমি নীরব নিঝুম বাড়ীটাতে বেশ নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে বসে গেলাম।

বাইরে খুব রোদ উঠেছিল। ঘরেও খুব গরম লাগছিল। তার মধ্যেই ব'সে আমি সেদিনকার প্রবন্ধটা সহজ সরল ক'রে আবার লিখছিলাম মাসীমাকে বোঝাবার জন্য। মাসীমা হয়তো

ঘুমোচ্ছেন, আসার আগেই এটাকে শেষ করতে হবে। লিখতে লিখতে বড় জলতেষ্টা পেল। গলাটা শুকিয়ে গিয়ে বারেবারেই কাশ আসতে লাগল। কিন্তু খালি বাড়ীতে একা একা অন্য ঘরে গিয়ে জল খেতে ইচ্ছে করল না। হয়তো কারও কিছু হারিয়ে যাবে, তখন সবাই বলবে আমিই নিয়েছি। আরও কিছুক্ষণ লিখে পুকুরে যাওয়ার জন্য কলমটা রেখে দিলাম। ওপর দিকে মুখ তুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এক হাতে একটা পাখা আরেক হাতে একগ্লাস সরবৎ নিয়ে আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার পরম শুভানুধ্যায়িনী, মাতৃস্নেহের মন্দাকিনী চাঁপামাসীমা। কোথায় চলে গেল আমার পিপাসা, সব ভুলে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

কোন্ অমৃতসিন্ধু যেন লুকানো আছে মাসীমার স্নেহস্নিগ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনিটুকুর মধ্যে। তাঁর দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে মেঘনানদীর কথা। ফটিকের মতো স্বচ্ছ সেই কৃষ্ণ নীরকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় শান্ত স্নিগ্ধ মসৃণ, কিন্তু তার মধ্যে নেমে স্নান করতে গেলে হৃদয় সংশয়ে সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওই অন্তহীন গভীর কালো অমৃতধারায় একবার ধরা দিলে আর যেন নিস্তার পাবে না কেউ, যেন কোন্ এক রহস্যমধুর মায়াজাল আপন কক্ষপুটে সমাবৃত ক'রে চিরতরে নিয়ে যাবে সর্বজনের অন্তরালে। পদ্মানদীর তরংগিত উচ্ছ্বাসকে আমি ভয় করিনে, কিন্তু শংকা হয় মেঘনানদীর ঘনকৃষ্ণ প্রশান্ত

নীরকে। আমি মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তের মতো নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েই রইলাম মাসীমার স্নেহসমাকুল মুখখানির দিকে। মাসীমা বললেন, অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন লেখাপড়া রেখে দিয়ে ?

তুমি এত সুন্দর কেন, মাসীমা ?

আমার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে মাসীমা বললেন. যাঃ দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে দিনের দিন। আমি সরবৎটা খেয়ে বললাম, সত্যি মাসীমা, তুমি খুব সুন্দর, এত সুন্দর আমি আর কোথাও দেখিনি। মাসীমা নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। এমনসময় বাইরে থেকে ডাক এল. মাঠাকরুণ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ একমুষ্টি ভিক্ষা পায়। অমনি মাসীমা উঠে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, বসুন ঠাকুরমশাই।

আর বসব না, মা, বেলা পড়ে গেছে।

একটু দয়া করতে হবে আপনাকে।

কি মা ?

একটি ছেলের হাতটা একটু দেখবেন।

এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী করার পক্ষপাতী আমি নই, মা।

কেন, আপনার ভবিষ্যদ্‌বাণী তো সবই সত্যি হয়. ঠাকুরমশাই।

ঠিক সেজন্যই আমার আপত্তি, মা। জ্যোতিষীর কাজ মানুষকে তার ভবিষ্যৎ সুযোগ দুর্যোগের কথা জানিয়ে দেওয়া. যেন সে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে দুর্যোগকে এড়িয়ে সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু শহরসভ্যতায় পরিপুষ্ট, জড়বাদী শিক্ষায় শিক্ষিত আজকালকার লোকদের

মধ্যে ইচ্ছাশক্তি বড় দুর্বল। ভবিষ্যদ্‌বাণীকে ভালর দিকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করার মতো মানসিক বল তাদের নেই। তারা মুখে বলে ভগবান মিথ্যে, শাস্ত্র মিথ্যে, কিন্তু কার্যতঃ এসবকে মেনে নেয় ধ্রুব সত্য ব'লে। তাই তাদের সম্বন্ধে যাই বলি তাই হয়ে যায় সত্য।

আমি যার কথা বলছি সে-ছেলেটি সেরকম নয়, ঠাকুরমশাই। আমি নিয়ে আসছি তাকে। ব'লেই মাসীমা আমার কাছে চলে এলেন। আমার হাত ধ'রে টেনে তুলতে তুলতে বললেন, চলো।

কোথায় ?

বিখ্যাত জ্যোতিষী গোপীনাথ আচার্য এসেছেন, তাঁকে দিয়ে তোমার হাতটা দেখাব।

কেন, কি হয়েছে আমার হাতে ?

লক্ষ্মীটি, দুষ্টুমি করো না, চলো।

আমি গিয়ে জ্যোতিষীর কাছে বসতেই তিনি আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বললেন, হাঁ, তোমার হাত দেখা চলে, পুরুষকার অত্যন্ত প্রবল তোমার।

সেটা কি ঠাকুরমশাই ?

তিনি বললেন যে মানসিক শক্তি দিয়ে মানুষ পরিবেশের সংগে সংগ্রাম ক'রে নিজের কর্মকে বিজয়ী ক'রে তোলে, যার জন্য তুমি মনে কর দৈবীশক্তি তোমার কর্মশক্তির কাছে তুচ্ছ সেটাই হচ্ছে তোমার প্রবল পুরুষকার। আমি বললাম, না ঠাকুরমশাই, আমি কাউকে তুচ্ছ মনে করি নে।

আমি মনে করি আমার কাজ আমি করব, ভগবানের কাজ ভগবান করবে, কাউকে পরোয়া বা তুচ্ছ করার দরকার নেই।

চাঁপামাসীমা একটা থালার মধ্যে চাল ডাল তরকারি টাকা ইত্যাদি এনে ঠাকুরমশাইর সমুখে রেখে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে বললেন, মানুষের কি এতটা সাহস থাকা ভাল, ঠাকুরমশাই ?

ভগবানের দিক থেকে কোন ভয় নেই মা, তিনি সাহসী লোক পছন্দ করেন। কিন্তু ভয় হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। ওর পুরুষকার এবং আত্মপ্রত্যয়ের জোরে ও অনেক অসাধ্য কাজও সাধন করবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ওর আত্মপ্রত্যয়ের উক্তিকে দাম্ভিক আস্ফালন মনে ক'রে বিরক্ত বা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবে ওর ওপর। এমনকি যার কল্যাণের জন্য ও সর্বস্ব দিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করবে, সেও পর্যন্ত ভুল বুঝবে ওকে। খুব শিগগিরই একটা ভীষণ বিপর্যয় আসার কথা ওর জীবনে, সাবধান হওয়া দরকার একটু।

আতংকে শিউরে উঠে মাসীমা বললেন, কি হবে, ঠাকুরমশাই ?

নিতান্ত আপন জনের কাছ থেকে একটা আঘাত আসবে।

একটা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলে হয় না ?

মাসীমার শংকিত চাহনিতে ফুটে উঠল একটা স্বপ্নময় আকুলতা। যে আকুলতা ঘুমিয়ে থাকে বালিকা কিশোরী তরুণী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সকল নারীর মধ্যে। সুসভ্যা প্রাসাদবাসিনী থেকে

অসভ্যা বনচারিণী পর্যন্ত সকল নারীর হৃদয়েই লুকিয়ে থাকে এই চিরন্তন মাতৃত্বের জ্যোতির্ময় উচ্ছ্বাস, অনুকূল যোগাযোগ পেলেই ফুটে ওঠে তার সকল সুষমা নিয়ে। ঠাকুরমশাই মাসীমার এই সস্নেহ উদ্‌বেগ উপলব্ধি ক'রে বললেন, স্বস্ত্যয়ন করা যাবে না কেন মা, খুব যাবে, কিন্তু কোনো দরকার হবে না ওসবের।

কেন, ঠাকুরমশাই?

স্বস্ত্যয়ন করা তো শক্তি দানের জন্যে, এ ছেলে তার নিজের শক্তি নিজেই পারবে উৎপাদন করতে। ব'লেই ঠাকুরমশাই টাকাপয়সা ও অন্যান্য জিনিস রেখে শুধুমাত্র চালটা নিয়ে চলে গেলেন। আমি মাসীমাকে বললাম, ঠাকুরমশাই লোকটি বোধহয় লোভী নয়।

একটুও নয়। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে কত রাজা মহারাজা কত চেয়েছেন তাঁকে বিত্তশালী করতে, কিন্তু তিনি নেননি কিছুই। পাণ্ডিত্যের সংগে কি যেন বিরোধ আছে টাকাপয়সার। কিন্তু তাঁর কথা যে ফলবেই?

তুমি এমন ঘাবড়ে গেলে কেন, মাসীমা?

রোজ সকালে উঠে তুমি ঠাকুরের চরণামৃত খাবে?

আমি কেন খেতে যাব ওই নোংরা জলগুলি?

সর্বনাশ! ব'লে মাসীমা ভয়ে শিউরে উঠে যুক্তকর কপালে ঠেকালেন। দেয়াল থেকে পরমহংসদেবের ছবিটা নামিয়ে আমার কপালে ছোঁয়ালেন।

বিকালবেলা বাড়ীর সকলে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এল জজবাড়ী থেকে। বিরাট বাড়ীর বিপুল জাঁকজমকের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সবাই। রাত্রে পড়তে বসেও শুনছিলাম সেসব কথা। আশ্রফালি এসে বলল, দাদাবাবু তোমাকে ডাকছেন। ব্যস্ত হয়ে বললাম, কোথায় প্রবোধদা?

দিদিমণির ঘরে।

আর কে আছে ওখানে?

দিদিমণিই শুধু দাদাবাবুর পায়ে সেঁক দিচ্ছেন।

যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে গেলাম প্রবোধদাকে দেখতে। কিন্তু প্রভাদির ঘরের কাছে যেতেই শুরু হ'ল ভয়। আজ পর্যন্ত আমি এ বাড়ীতে অন্য কারও থাকার ঘরে যাই নি। পাশের চাঁপামাসীমার ঘরটাতেও না। প্রভাদির ঘরে তো নয়ই। সুন্দর দামী পর্দা টাংগানো থাকে তাদের জানালায়, তারা যেন আমাকে মানা করে দেয় সেদিকে যেতে।

অনেক দ্বিধা সংকোচের পর ঘরে গিয়ে দেখলাম প্রবোধদা শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছেন, প্রভাদি গরম সেঁক দিচ্ছেন তাঁর পায়ে। এমন কমনীয় সেবাভাব সচরাচর দেখা যায় না। সাম্যবাদী সন্ন্যাসীকে সেবা করছেন গর্বিতা ধনীকন্যা, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল আমার। দুজনের উদ্দেশ্যেই মনে মনে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। আমাকে দেখে খুব খুশী হয়ে প্রবোধদা বললেন, বোসো। আমি বললাম, পায়ে লাগল কিক'রে?

বাথরুম পিছল ছিল, হঠাৎ পড়ে গেছিলুম।

ডাক্তারবাড়ী যেতে হবে?

না, তোমায় ডেকেছি অন্য কথা বলতে। আজ হেডমাষ্টারবাবুর সংগে তোমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, সব টিচারদের ধারণা আগামী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে তুমি ফার্ষ্ট হবে। খুব ভাল ক'রে পড়বে এখন থেকেই।

প্রভাদি বললেন, তুমি আশীর্বাদ করো ওকে, তোমার আশীর্বাদ নিষ্ফল হ'তে পারে না কখনও।

প্রবোধদা বললেন, ওদিকে আবার মহেশপুর সত্যাগ্রহ কমিটি আমাদের কাছে লোক চেয়ে পাঠিয়েছে। অন্ততঃ একজন ভলান্টিয়ার না পাঠাতে পারলে বাজগাঁ কংগ্রেসের আর মান থাকবে না। কিন্তু লোক একদম পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেরা কেউ জেল খেটে পড়া নষ্ট করতে চায় না।

আমি বললাম, আমি যাব সেখানে।

প্রভাদি বললেন, তোর পড়ার ভীষণ ক্ষতি হবে।

প্রবোধদা বললেন, সমাজের ব্যথায় মন যার কাঁদে, নিজের উন্নতির চিন্তা কি পারে তার পথরোধ করতে?

প্রভাদি বললেন, উঁচু ডিগ্রী না থাকলে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টও দেবে না বড় চাকরি।

প্রবোধদা আমাকে বললেন, সে কথা সত্যি। চাঁপা কত ভাল লেখাপড়া শিখেছে, কংগ্রেসের কত কাজ করেছে, তবু মহিলা সংঘের সেক্রেটারি তারা করতে চায় প্রভাকে।

একথা শুনে প্রভাদির মুখখানি একটু মলিন হয়ে গেল। বললেন, অবশ্য তাদের অন্যকোনো গুরুতর কারণ থাকতে পারে।

আমি সত্যাগ্রহে যাবার আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বেরিয়ে আসার সময় প্রবোধদা বললেন, তারা যদি আবার লোক চায় তখন বিবেচনা করে দেখা যাবে, এখন ভাল্ ক'রে পড়তে থাক। আমার ঘরে ফিরে এসে দেখলাম চাঁপামাসীমা ব'সে আছেন প্রতীক্ষায়। জিগ্গেস করলেন, কি বললেন প্রবোধদা? আমি বললাম, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এবার আমাকে ফার্স্ট হতে হবে। মাসীমা বললেন, শুধু ফার্স্ট নয়, আগের রেকর্ড ভাংগতে হবে।

এটা কি সহজ কথা নাকি?

তোমার ইচ্ছা হ'লে সবই সহজ।

তুমি ফার্স্ট হও না কেন, তোমার বুদ্ধি তো কত বেশী?

সাংসারিক বুদ্ধি আর জ্ঞানার্জনের বুদ্ধি তো এক নয়।

কেন?

একটা প্রত্যক্ষ, আর একটা পরোক্ষ।

কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে মহেশপুর সত্যাগ্রহে।

মাসীমা আমার কথাটা তেমন বিশ্বাস করলেন না, একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, সে পরীক্ষার পর দেখা যাবে।

আগেই যেতে হবে, আমি ছাড়া কাউকে পাওয়া গেল না।

প্রবোধদাদের বিপ্লবী-সাম্যবাদী-সমিতি আজকাল মার্ক্সিষ্ট-সাম্যবাদী-দলের সংগে মিলে কাজ করছে, কত লোক আছে তাদের, পাওয়া গেল না কেন?

আমি বললাম, মার্ক্সিষ্ট সাম্যবাদী দল চায় না কংগ্রেস বড় হোক, বিপ্লবী-সাম্যবাদী-সমিতি ব্যস্ত আছে কৃষক আন্দোলন নিয়ে। মাসীমা বললেন, তুমি তো শ্রমিক কৃষক দুই আন্দোলনেই আছ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজও কর, তুমি যাবে কেন?

আমি যে কংগ্রেসেরও স্বেচ্ছাসেবক।

আসল কথা তোমার লেখাপড়ার চিন্তা কেউ করে না।

করবে না কেন, প্রভাদি ভীষণ আপত্তি করেছেন।

প্রভা করেছে সত্যি?

হাঁ।

তাহলে প্রবোধদাও আপত্তি করবেন।

তাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব, না মাসীমা?

হাঁ খুব ভাব, ওরা একসংগে কাজ করবে বোধ হয়।

তাঁদের মধ্যে আর অমিল হবে না কোনোদিন।

তা বলা যায় না।

কেন?

প্রবোধদা বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক, আর ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে প্রভার মধ্যে আছে অন্ধ ইংরেজানুকরণের ঝোঁক। তাছাড়া এমন দুটো দোষ আছে যা যেকোনো মেয়ের পক্ষেই নিতান্ত অশোভন।

কি দোষ?

জেদ আর মুখরতা মেয়েদের যত কম থাকে ততই তারা সুখী হয়। তাদের গুণগুলিকেও নষ্ট করার পক্ষে এদুটোই যথেষ্ট।

তবু একসংগে থাকলে বেশ হয়, কত ভাল মানুষ তাঁরা।

তাহোক, কিন্তু তুমি সত্যাগ্রহে যেতে পারবে না পরীক্ষার আগে। প্রবোধদা প্রভা বললেও না। এঁরা সবাই পাশ ক'রে বড় হয়ে গেছেন, তুমিও এতটা বড় হযে নাও তারপর যাবে। এখন আমি তোমাকে দেব না ভবিষ্যতটা মাটি করতে।

মাসীমা হঠাৎ কেন এতটা গম্ভীর হয়ে সত্যাগ্রহের কথা বললেন, কেনই বা প্রভাদি প্রবোধদার ওপর এমন বিরূপ হলেন বুঝতে পাবলাম না। আমি বললাম, ইংরেজের শোষণে দেশের লোক শেষ হয়ে গেলে ভবিষ্যতটা আমার সোনা হলেই বা কি লাভ হবে? তিনি বললেন, অনেক লাভ হবে, যে লেখাপড়া শেখে না সে যত ভালই হোক না কেন তাকে নিয়ে কেউ গৌরব করে না।

নাই বা করল, আমার ক্ষতি কি?

খুব ক্ষতি, তুমি যেতে পারবে না।

রাজগাঁ কংগ্রেসেব নাম ডোবাতেও আমি পারব না।

স্কুলে খবর এল আমি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম হয়েছি। খুব সুনাম হয়ে গেল আমার চারদিকে। এ ধরণের সুনাম আগে আর হয়নি কখনও। স্কুলের ভাল ছাত্রেরা বড় মুস্কিলে পড়ে গেল। আগে তারা আমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না, এখন আমারই নিন্দায় হয়ে উঠল পঞ্চমুখ। গৌরদা খবর পেয়ে ছুটে এসে আমাকে বুকে তুলে নাচতে লাগল। হেডমাষ্টার সবার কাছে গর্ব ক'রে

বলতে লাগলেন, সমীরকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম সে সাধারণ ছেলে নয়। এসব হুলস্থুলের মধ্যে আপাততঃ আমার সত্যাগ্রহে যাওয়ার কথাটা চাপা পড়ে গেল।

ছয়

কিন্তু হেডমাষ্টারবাবুর সন্তোষ আমার পক্ষে হ'ল হিতে বিপরীত। তিনি চিরকুমার। নেশা বা বিলাসিতা পছন্দ করেন না। প্রাণপণ চেষ্টা করেন ছাত্রদের সদাচারী করতে। কয়েকজন বাছাই ছাত্র নিয়ে একটি ব্রহ্মচর্য ক্লাশ করেন সদুপদেশ দেওয়ার জন্য। দুর্ভাগাবশতঃ আমিও পড়ে গেলাম তাঁর বাছাই ছাত্রদেব মধ্যে। নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আমার মতো সচ্চরিত্র ছেলে বড় একটা দেখা যায় না সংসারে। আমাকে ভর্তি করে নিলেন তাঁর ব্রহ্মচর্য ক্লাশে। পড়তে দিলেন অশ্বিনী দত্তের লেখা 'ভক্তিযোগ' বইখানা।

রাত্রে ব'সে ব'সে সেখানা পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম হেডমাষ্টারবাবুর কথা। যেমন বিশ্রী লাগছিল বইটা তেমন বিশ্রী লাগছিল তাঁর কথাগুলি। নারীর দেহবিলাসকে যে তিনি মনে করেন নরচিত্ত হরণ করার নিশ্চিত যাদুকাঠি, আমি কিছুতেই পারছিলাম না তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে। আমার মনে

হচ্ছিল ছাত্রদের উন্নত করার চেয়েও তিনি বেশী আনন্দ পান এসব প্রসংগগুলি আলোচনা করার মধ্যে। মাসীমা এসে 'ভক্তিযোগ' বইটা দেখে বললেন, এটা আবার কি হচ্ছে ?

হেডমাষ্টারবাবু পড়তে বলেছেন।

তুমি বুঝবে না এসব বই।

তবু তিনি আমাকে দিয়ে মিছে কথাগুলি পড়াবেনই।

মিছে কথা কোন্‌গুলি ?

লিখেছে মেয়েদের দেখলেই ছেলেদের মনে খারাপ ভাব আসে। কিন্তু যার আসে না তার কি লাভ হবে এ-বই পড়ে ?

তোমার মনে কি কিছুই আসে না ?

না এলে কি আমার দোষ ?

সবার আসে, তোমার আসে না তা তিনি বুঝবেন কিক'রে ? সাধারণ মানুষের মনের ভিতরটা কুশ্রী থাকে, তাই তাদের বিশ্রী লাগে না এই বই পড়তে। ওকি তুমি ঘুমুচ্ছ নাকি, সমীর ?

ও, না, তুমি বল।

না তুমি ঘুমোও গে। ঘুম পেলে জোর ক'রে পড়ার চেষ্টা না ক'রে শুয়ে পড়া ভাল। নইলে পড়াও নষ্ট হয়, ঘুমও নষ্ট হয়। তুমি শেষরাত্রে উঠে পড়, তোমার ক্ষতি কি ?

আমি এসে শুয়ে পড়লাম। একবার শুলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। ছোটবেলায় একদিন সন্ধ্যেবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে

দেখি জামাইবাবু এসেছেন চাকরির জায়গা থেকে। অমনি ছুটে গিয়ে বড়দিকে বললাম, আমার সন্দেশ কই? বড়দি বললেন, সবাই একবার খেয়েছে, তুই কবার খাবি? আমি মা'র দিকে তাকাতে তিনি বললেন, রাত্রে যে তোকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দিল? শুনে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম সন্দেশের স্বাদটা মনে করতে, কিন্তু কিছুতেই না পেরে কি যে আপশোস হয়েছিল আমার মনে। মা বলেছিলেন, সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণ!

একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া লেগে আমাব ঘুম ভেংগে গেল। মাসীমা তাঁর কোমল স্নিগ্ধ হাত দুখানি দিয়ে আমার ঘাড়টা ধ'রে সোজা ক'রে বালিসের ওপর তুলে রাখলেন, মশারিটা ঠিক ক'রে গুঁজে দিলেন। ঘুমের সময় আমি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতাম ব'লে মাসীমা রাত্রে অনেকবার ঘুম থেকে উঠে আমার বিছানা ঠিক করে দিতেন। তাঁর মতো একজন এতবড় মহিয়সী মহিলা কেন এত স্নেহ যত্ন করেন আমার মতো একটা ছন্নছাড়া সর্বহারাকে? মনে হ'ল এমন আপনজন আর কারও হয়নি কোনোদিন, এত ক'রে কেউ কারও সুখ দুঃখের ওপর নজরও রাখেনি কোনোদিন।

আবার গিয়ে মাসীমা লিখতে বসলেন। ঘুমন্ত নিঝুম পুরীতে আপন মনে সমাপন ক'রে চললেন নিভৃত হৃদয়ের গভীর সাধনাটুকু। দুলে দুলে লিখতে লাগলেন। যেমন ক'রে ছোটবেলায় বড়দিরা পুকুরঘাটে বসে লাউল-ব্রতের কথা

বলতেন। লিখতে লিখতে মাসীমা গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে, আজ আমি যে ব'সে আছি তোমারি আশ্বাসে।' তাঁর অপূর্ব রূপ, তন্ময় সাধনা, সুমধুর আবেদন সব মিলে আমার অন্তরাত্মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁর কাছে যাঁর আশ্বাসে ব'সে থাকেন মাসীমার মতো মহিমাময়ী মহিলাও। এমনসময় মেজমামীমা এসে বললেন, ঘুমুবি নে, চাঁপা?

মাসীমা একটু দ্বিধার সংগে বললেন, পড়া যে শেষ হয়নি?

তা হোক, তুই শুতে যা। পরশু যাবি এলাহাবাদ, দিন রাত্রি কাটাবি না ঘুমিয়ে, তোর নিজের শরীর ভাল না থাকলে রোগীর সেবা করবি কিক'রে?

মেজমামীমার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। মাসীমাকে ছেড়ে থাকার কথা কল্পনা করতেও ভয় করল। মেজমামীমা বললেন, তোর শিশুটি বুঝি ঘুমচ্ছে?

মাসীমা বললেন, একেবারে কুম্ভকর্ণ।

যদি তৈরি করতে পারিস্ মানুষের মতো মানুষ হবে।

বয়সের তুলনায় বুঝ বড় কম।

বয়স তো বেশী নয়, গড়নটা বড় বলেই এরকম বড় দেখায়। ওর মা দাদা দুজনই সন্ন্যাসী প্রকৃতির ছিলেন, স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের দেখেই ও বড় হয়েছে তাই সাংসারিক বুদ্ধি হয়নি।

মান অভিমান বড্ড বেশী।

সেই একমাত্র ভয়। কখন যে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় তার ঠিক নেই। ওর স্বভাবটা হয়েছে ঠিক ওর মেজমামার মতো। সেজন্য ওর মামা ওকে ভালও বাসেন খুব। পুলিশের ভয়ে ওদের খোঁজখবর নিতে পারেননি, নইলে হয়তো পড়ার জন্য এতদিনে ওকে বিলাত পাঠিয়ে দিতেন।

বাতিটা কমিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে তাঁরা দুজনে শুতে চলে গেলেন। আমার মনটা অস্থির হয়ে উঠল বিলাত গিয়ে পড়াশুনা করার জন্য। লালমোহন ঘোষ, রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের স্বপ্ন এসে আমাকে পেয়ে বসল। স্বাধীনতার যত বড়াই না কেন করুক, আমাদের দেশের লোকের মন পড়ে আছে বিদেশীদের কাছে। বিলাত-ফেরতা মানুষ যত অপদার্থই হউক, আমার দেশবাসী তাকে পূজা করবেই করবে। আমি যদি সত্যিকার গুণী হয়ে বিলাত-ফেরতা হই তাহলে তারা কৃতার্থ হবে আমাকে তাদের নেতা ব'লে বরণ ক'রে। মেজমামা যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই বিলাত পাঠাবেন আমাকে।

বিলাত গেলে মাসীমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। আমার স্বভাবের এই একটা বিশ্রী দোষ। যখন যাকে ভাল লাগে তখন আর তাকে চোখের আড়াল করতে পারিনে। যথাসর্বস্ব তার জন্য বিসর্জন দিয়েও আরও কি করব তাই ভেবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠি। নিজেকে একেবারে তার

মধ্যে বিলীন ক'রে দিতে না পারলে মনে আর শান্তি পাই নে। তার দোষও আমার কাছে দেখা দেয় গুণ হয়ে। তার তুচ্ছ ব্যাপারও আমার কাছে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে শত বর্ণে সুষমায়। দুদিন আগে যে সে আমার ছিল না, দুদিন পরে চলে গেলে যে আমি তাকে ধ'রে রাখতে পারব না, আমি তাকে যত ভালবাসি সে যে আমাকে তত ভাল নাও বাসতে পারে এসব কথা মনেও আসে না আমার। শুধু মনে হয় সে আমার চিরদিনের চির আপনার, তাকে ছাড়া যে আমার জীবনের সবই অন্ধকার।

মাসীমা চলে গেলেন এলাহাবাদে। একজনকে ছেড়ে আরেকজন কয়েকদিনের জন্য চলে গেলেও যে এত ব্যথা লাগে তা জানতাম না। আজকাল আমার পড়ায় মন বসে না, খেতে ভাল লাগে না। শুধু একা একা বসে থাকি। কখনও বা বনে বাদারে ঘোরা-ফেরা করি। আর কেবল ভাবি মাসীমার কথা। পাখীর ডাকের কোনো অর্থ বুঝিনে, তবু আনমনা হয়ে কান পেতে থাকি সেদিকে।

একদিন ডাক পিয়ন এসে একটা চিঠি দিল আমার হাতে। খামের ওপর গোট গোট সুন্দর হাতের লেখাটা দেখেই বুঝলাম মাসীমা লিখেছেন। আনন্দে ভরে গেল মন আমার। খুলে পড়লাম। কি লিখেছেন খেয়াল করলাম না, মাসীমা লিখেছেন সে আনন্দেই আত্মহারা হয়ে প'ড়ে গেলাম। আবার পড়লাম। আবার পড়লাম। পড়ে পড়ে যেন আশ মেটে না আর।

হাতের-লেখাগুলি হয়ে ওঠে অপরূপ, তাদের অর্থ হয়ে ওঠে অপূর্ব রহস্যময়। একটা বানান ভুল ছিল, সেটা তখনি শুদ্ধ ক'রে রাখলাম ঠিক মাসীমার মতো ক'রে লিখে। লোকে দেখলে যেন না বলতে পারে মাসীমাও ভুল করেন। গৌরদা এসে বলল, তোর নাম পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি।

কোথায় ?

অল বেংগল ডিবেট কম্পিটিশনে। তর্কের বিষয় "কি'করে বিশ্বে শান্তি আসতে পারে।" নাম উইথড্র করার শেষ তারিখ কাল চলে গেছে। ডিবেট হবে পরশুদিন। কলেজের ছাত্রও যোগ দিয়েছে তার মধ্যে।

আমি বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।

বিপরীত পক্ষ বলবে 'লীগ অব নেশনস্' বিশ্বে শান্তি আনতে পারবে, তুই সেকথার প্রতিবাদ করবি। এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে ?

আমি পারব কেন অতসব বড় বড় মানুষদের সংগে ?

সেকথা হেডমাষ্টারবাবু জানেন। আমাকে বলেছেন তোর নাম দিয়ে আসতে। তোকে বলেছেন তোর বক্তব্যটা লিখে নিতে। এখানে যদি ফাষ্ট' হতে পারিস্ তো সেটা জেনেভাতে 'লীগ অব নেশনস্'এর আফিসে পাঠানো হবে!

অগত্যা গুরুজনের মান ও স্কুলের যশ বজায় রাখতে আমাকে শহরে গিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতাতে যোগ দিতে হ'ল। বহু বক্তা বহু কথা বললেন বিশ্ব-শান্তি সম্বন্ধে। অবশেষে

আমিও উঠে আমার যে বক্তব্য বললাম তা হচ্ছে এই : শান্তি বলতে আমরা বুঝি এক দেশ আরেক দেশের সংগে যুদ্ধ করবে না। কেন যুদ্ধ করে? শখ মেটাতে, না অভাব মেটাতে? মানুষ যুদ্ধ করে অভাব মেটাতে। অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়ে সে চায় নিজের শূন্যতা পূর্ণ করতে। কখনও অভাব হয় খাদ্যের, কখনও অভাব হয় বস্ত্রের, কখনও অভাব হয় আশ্রয়ের। এসব হচ্ছে স্বাভাবিক অভাব। কিন্তু আরেক ধরণের অভাব আছে যা কাল্পনিক। যান্ত্রিক সভ্যতায় জীবনমানের উচ্চতা নিম্নতা নির্ভর করে কাল্পনিক অভাব পূরণের বেশী কমের ওপর। কিন্তু জীবনমানের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই, সে কেবল বেড়েই চলে। ফলে যে দেশ যত সুসভ্য তার অভাব তত বেশী। সে গিয়ে আক্রমণ করে অন্য দেশকে। যান্ত্রিক জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে পাগল করে দেয় আকাংখা দিয়ে কিন্তু দিতে পারে না কোনো তৃপ্তির সন্ধান। অপূরণীয় জীবনমানকে পূর্ণ করার জন্য তাইতো তার এমন প্রমত্ত অভিযান। শান্তি আনতে হ'লে যেমন প্রয়োজন সম্পদসাম্য স্থাপন করা, তেমনি প্রয়োজন অন্ধ ভোগের জীবনদর্শনকে পরিবর্তন করা।

আমার কথা ভাল ক'রে শেষ না হতেই চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল শ্রোতাদের করতালি ধ্বনিতে। সবাই আমার জয়জয়কার করতে লাগল। আমার বিরুদ্ধ-পক্ষও বলল আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অভিনব। অবশেষে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রাজগাঁ স্কুলই প্রথম হ'ল। স্কুলের সবাই

আমাকে নিয়ে উল্লাস করতে লাগল। ভাল ছাত্রদের মাথায় আবার বাজ পড়ল। কোত্থেকে একটা ছাত্র উড়ে এসে জুড়ে বসবে তাদের ওপরে এটা তারা সহ্য করতে পারল না। প্রথম বলে বেড়াল আমার প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দুটোই খারাপ হয়েছে। লোকে যখন সেকথা গ্রাহ্য করল না তখন বলতে লাগল প্রভাদি আর প্রবোধদা আমাকে সাহায্য করেছেন। বারীনও সায় দিতে লাগল তাদের এসব কথায়। গৌরদা এসে ছল্‌ছল্‌ চোখে আমাকে বলল, ব্যাটারা সব নিজেরা তো পারে না তাই হিংসেয় নিন্দে করছে, এবার পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে তুই একেবারে তাক লাগিয়ে দিবি ওদের। অন্যান্য গাধা ছাত্ররাও এসে সানন্দে বলল, তুই বইয়ের জন্য ভাবিস্‌ নে, সমীর, আমরা চাঁদা তুলে কিনে দেব, ওদের কাউকে আর ফার্ষ্ট হতে দিবি নে। অরুণকে অন্তত একশ' নম্বরে বিট করবি, ব্যাটার অহংকার বড় বেড়ে গেছে।

বাড়ী ফিরেই প্রবোধদাকে খবরটা দেবার জন্য প্রভাদির ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম সেখানে মহা হুলস্থূল পড়ে গেছে। মিষ্টার সান্যাল আসবেন এখন, তারই অভ্যর্থনার আয়োজন চলেছে। আমার আনন্দ আরও বেড়ে গেল এতবড় বিখ্যাত মানুষ দেখব আশায়। প্রভাদির ঘরটা খুব ভাল ক'রে সাজানো হয়েছে। নিজে তিনি সেজে গুজে একেবারে রাণী হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বড়মামীমা রুক্ষস্বরে বললেন, আজ আর তুই আসিস্‌ নে এদিকে। আমি তখন একটু

আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম মিষ্টার সান্ন্যালকে দেখার জন্য। একটু পরে সাহেবী পোষাক পরা একজন লোক প্রবোধদার সংগে এসে প্রভাদির ঘরে হাজির হলেন। প্রবোধদারই সমবয়সী কিন্তু তাঁর মতো জোয়ান নয়। প্রবোধদা প্রভাদি ও বড়মামীমাকে বললেন, আমার বন্ধু মিষ্টার সান্নাল, তাঁরা দাঁড়িয়ে বললেন, গুডমর্নিং। তারপর তাঁরা ব'সে গল্প করতে শুরু করলেন। প্রবোধদা একটা সোফার ওপর ব'সে প্রভাদির অনুরোধে কতগুলি জরুরী কাগজপত্র দেখতে লাগলেন।

বড়মামীমা বললেন, আজ সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল একজন বড় মানুষের সংগে দেখা হবে। মিষ্টার সান্ন্যাল বললেন, আপনাদের কালচারের কথা সবার মুখেই শুনি তাই প্রবোধদার সংগে এলুম নিজের চোখে দেখতে। বড়মামীমা বললেন, বেশ ভাল করেছেন। আপনার তো এদিকে কোনো আত্মীয় নেই, আমাদেরই আত্মায় মনে ক'রে যখন খুশি চলে আসবেন এখানে।

প্রভাদি এতক্ষণ একটা এম্‌ব্রয়ডারি নিয়ে বসেছিলেন। তিনি সাধারণতঃ এম্‌ব্রয়ডারি করেন না, কিন্তু কোনো ভদ্রলোক এলে তাঁর সংগে কথা বল্বার সময় এম্‌ব্রয়ডারি নিয়ে বসেন। তিনি মুখ নিচু ক'রে সেলাইর দিকে তাকিয়েই বললেন, মিষ্টার সান্নাল, আপনার মুখের ইংরেজী শুনে মনে হয় আমি আবার অক্সফোর্ডে এয়েচি। সান্নাল বললেন, প্যারিস ছাড়ার পর আপনার মতো সুন্দর মেয়ে আমার চোখে আর পড়েনি।

আপনাকে দেখলে মনে হয় যেন ইংরেজ অফিসার।

নরওয়ের রাজধানী বুখারেষ্টেও একজন বলেছিল একথা।

আমার মনটা বড খারাপ হয়ে গেল। কত আশা করেছিলাম মিষ্টার সান্ন্যালের মতো বিদ্বান মানুষ কত উঁচু ধরণের কথা বলবেন, আমাদের কতকিছু শেখার থাকবে তার মধ্যে। নরওয়ের রাজধানী যে অসলো, রুমানিয়ার রাজধানী যে বুখারেষ্ট সে কথাও তিনি জানেন না। হয়তো তিনি ভুলে বলেছেন, নইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে এতবড় চাকরি দিয়েছে কেন? তবু প্রবোধদার মতো জ্ঞানগম্ভীর ব্যক্তির পাশে তাঁকে বড় হাল্কা ব'লে মনে হ'ল।

চা খাওয়ার সময় এলো। প্রভাদি নিজেই পরিবেশন করতে লাগলেন। মিষ্টার সান্ন্যালের সমুখে একটা ছোট তেপায়া এনে রেখে তার ওপর তাঁর চা ও খাবার দিলেন। ঘরে আরেকটাও তেপায়া ছিল, কিন্তু প্রবোধদার চা ও খাবারটা দেওয়া হ'ল মেজেতেই। মিষ্টার সান্ন্যাল গল্প করতে করতে চা খাওয়া শেষ করলেন। প্রবোধদা আপনমনে প্রভাদির কাগজপত্র দেখতে লাগলেন, টেরও পেলেন না কোথায় দেওয়া হয়েছে তাঁর চা। কিন্তু আমার বড় বিশ্রী লাগল এটা দেখতে, কত লোক আসা যাওয়া করছে, তাদের পায়ের ধুলো এসে পড়ছে প্রবোধদার খাবারের ওপর। প্রবোধদা বিলাত ফেরতা বিদ্বান হয়েও স্বদেশীর জন্য সরকারী বড় চাকরি নেননি। তাই প্রভাদিরা তাঁর মতো পঞ্চাশটাকা মাইনের

স্কুলমাষ্টারকে হাজারটাকা-মাইনের অফিসারের সমান ক'রে খেতে দিতে পারলেন না। আমার মা বলতেন অভিজাত পরিবারে মান সম্মান নির্ভর করে কার কত টাকা আছে তার ওপর।

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। বড় রাগ হ'ল প্রবোধদার ওপর। কেন তিনি এলেন বোর্ডিং ছেড়ে এ বাড়ীতে? তিনি প্রভাদিকে ভালবাসতে পারেন, তাই ব'লে সমস্ত সাম্যবাদীদের মাথা ধনীদের কাছে নিচু করে দিতে পারেন না, তিনি যে বিপ্লবী-সাম্যবাদী সমিতির নেতা তাও ভুলতে পারেন না। আর মিষ্টার সান্নাল মার্ক্সিষ্ট-সাম্যবাদী দলের নেতা হয়ে কিক'রে এরকম একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলেন? তিনি যে বিলাতে প্রবোধদার ছাত্র ছিলেন সেকথাও কি ভুলে গেলেন? প্রভাদির ভালবাসাই বা কিরকম, প্রিয়জনকে ছোট ক'রে তিনি নিজেই কি ছোট হয়ে গেলেন না?

এসব সাম্যবাদীদের চেয়ে বরং মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস অনেক ভাল। কিন্তু কংগ্রেসেও যে আছে কত স্বার্থপর, মহাত্মাগান্ধীর নাম ভাংগিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে। আর ভাবতে পারলাম না, আমার চিন্তা ভাবনা সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। মনে হ'ল স্বাধীনতার যুদ্ধ, কংগ্রেস, সাম্যবাদ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া ক'রে বড় চাকরি করাই সবচেয়ে ভাল। যাদের বিদ্যা বুদ্ধি মস্তিষ্ক নেই তারাই স্বদেশীকে জীইয়ে রেখে একদিন আমাকে ডেকে নেবে নেতা ব'লে।

সাত

স্কুলের প্রিটেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল। ছুটির দিন ব্রহ্মচর্য ক্লাশে আমি 'ভক্তিযোগ'খানা হেডমাষ্টারবাবুর কাছে ফেরত দিলাম। তিনি আমাকে জিগগেস করলেন, ভাল ক'রে পড়েছ তো ?

না, সার্।

কেন ?

ভাল লাগল না, সার্।

তার মানে ?

মিছে কথায় ভরে রেখেছে বইটা।

হেডমাষ্টারবাবুর মুখ চোখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। আমার বুক ভয়ে কাঁপতে লাগল। অন্যান্য ছাত্ররা আতংকে শিউরে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, চলে যাও তুমি এখান থেকে, দেখব যাতে তুমি অন্য ছেলেদেরও খারাপ করতে না পার।

আমি চলে এলাম। মনটা একেবারে ভেংগে গেল। স্কুলের এতগুলি শিক্ষকের মধ্যে একমাত্র হেডমাষ্টারবাবু আর প্রবোধদাই আমাকে ভালবাসতেন। প্রবোধদা আজকাল আর আমার খোঁজখবর নেওয়ার সময় পান না। প্রভাদি খুঁটিনাটি ব্যাপারে মিছিমিছি প্রবোধদাকে আঘাত দিয়ে কথা বলেন,

সান্ন্যাল এলেই লেখাপড়া ছেড়ে গল্প করতে যান, সেজন্য তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। আজ আবার হেডমাষ্টারবাবুও আমার ওপর রুষ্ট হলেন।

কিন্তু সব দুঃখ ঘুচে গেল যখন বাড়ী এসে শুনলাম আমার মা অন্তরীন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বাবার মামাবাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। মেজমামীমা আমাকে একটা টাকা দিয়ে বললেন, মা'র সংগে গিয়ে দেখা করে এসো।

পথে বেরিয়ে শুনতে পেলাম মুসলমানেরা ইন্দ্রপুর আক্রমণ করবে। তাদের সর্দার ওসমান ব্যাপারী। দাংগাগুলি এতদিন শহরেই চলত। এখন গ্রামে শুরু হয়েছে। একদল হিন্দু ছেলে ইতিমধ্যেই ইন্দ্রপুর চলে গেছে। সেখানে যে আমার বড়দির বাড়ী! আমিও হাঁটতে লাগলাম ইন্দ্রপুরের পথে। বড় রাগ হ'ল মুসলমান জাতটার ওপর। এদের মধ্যে কি মায়া-মমতা ধর্ম-কর্ম বলে কিছুই নেই! ওসমান ব্যাপারী বাবার বন্ধু। তাকে আমরা কাকা ডাকতাম। সেও আদর করে আমাকে কাকা ডাকত। সে বড়দিদের বাড়ী আক্রমণ করবে কিক'রে?

একে জল-কাদার পথ, তাতে হয়ে গেল অন্ধকার রাত্রি। নির্জন রাস্তা, যদিও বা দু'একজন লোকের সংগে দেখা হয়, তারা সবাই মুসলমান। যখন দিক হারিয়ে ফেললাম তখনও কাউকে জিগগেস করতে ভরসা পেলাম না কোন্ পথে ইন্দ্রপুর যেতে হবে। আপন মনে হাঁটি, আর ভাবি যদি এমন অস্ত্র

বা মন্ত্র পেতাম যা দিয়ে মারতে পারা যায় হাজার হাজার মুসলমান, বেশ মজা হ'ত তাহলে। কোনোমতে যদি ওসমান ব্যাপারীকে মারতে পারা যায় তাহলেও তো চুকে যায় ল্যাঠা। কিন্তু তাকে চিনব কিক'রে, অনেক বছর যে দেখিনি। সেই কবে সে চলে গেছে আসামে ব্যবসা করতে। ছোটবেলায় ওসমান ব্যাপারীর বাড়ী গিয়ে তার মায়ের কোলে বসে কত যে মাংস-ভাত খেয়েছি তার ঠিক নেই। তার স্ত্রী রাজগাঁয়ের মেয়ে। আমার মায়ের কাছে ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেছিল তাই মাকে খুব ভালবাসত, ডাকত রাংগাদি ব'লে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে যেন হেঁকে উঠল, কে যায়?

আমি।

আমিটা কে?

ইন্দ্রপুর যাব।

কোন্ বাড়ী যাইবা?

ডাক্তার বাড়ী।

লাঠি লণ্ঠন নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে কয়েকটা লোক তেড়ে এল আমার কাছে। সবাই তারা মুসলমান, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। একজন বলল, শালা চোর, নিয়া চল্ করিমের বাপের কাছে। অমনি তারা আমাকে ধরে নিয়ে এল এক চাষীর বাড়ী। বাড়ীর কর্তাকে বলল, এক শালা হিন্দু চোর ধইরা আনছি, ধরা পইড়া কয় ইন্দ্রপুর ডাক্তার বাড়ী যাইব, শালা জানে না যে ঐ বাড়ীতে এখন কেউ থাকে

না। বাড়ীর কর্তা কিন্তু খুব ভদ্রভাবে আমাকে জিগগেস করল, ডাক্তারবাড়ী তোমার কি হয়?

আমি বললাম, বোনের বাড়ী।

বোনের জামাই কে?

ডাক্তারবাবু।

কৌতূহলান্বিত হয়ে সে বলল, তোমার বাড়ী কই?

সামন্তপুর।

তুমি সমীর-কাকা না?

ওসমান-কাকা, তুমি!

অন্য সকলে বাইরে চলে গেল। ওসমান ব্যাপারী উঠে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আহাহা, এই অন্ধকারে দুধের শিশু, তুমি কই চলছিলা, কাকা?

ইন্দ্রপুর বড়দির বাড়ী যাচ্ছিলাম।

তারা তো বাড়ীতে থাকে না আজকাল, শহরে আছে।

খুড়িমা বেরিয়ে এসে বলল, রাংগাদির শরীর কেমন আছে?

কিছুই জানি নে।

কেন?

আমি থাকি মামাবাড়ী, মা থাকেন বাবার মামাবাড়ী।

ওসমান-কাকা জিগগেস করল, দাদাভাই কোথায় আছে? আমি বললাম, বাবা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। আমার কথা শুনে কাকা খুড়িমা দুজনেরই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বিশ্রাম ক'রে আমি হাত মুখ ধুয়ে এলাম।

খুড়িমা তার বোনের মেয়েকে বললেন, মঞ্জু, তোর সমীরদা এসেছে। ডাক শুনে মঞ্জু এসে আমাদের সমুখে দাঁড়াল। মঞ্জুকে আমি আগে কয়েকবার দেখেছি। এখন আর সেই ছোট মঞ্জু নেই, লজ্জায় আমার দিকে তাকাল না। খুড়িমা বললেন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, দাদাকে প্রণাম কর্, তারপর তুঃখাই মণ্ডলের বাড়ী থেকে তুধ কলা মুড়ি কিনে নিয়ে আয়। মঞ্জু আমাকে প্রণাম ক'রে পাশের হিন্দু চাষীর বাড়ী যাচ্ছিল, আমি বললাম, তোমাদের সংগেই খাব খুড়িমা। তিনি বললেন, না, তাতে তোমার আমার তুজনেরই গুনাহ্ হবে, যার যেটা ধর্ম সেটা মেনে চলাই ভাল।

আমি যে আগে কত খেয়েছি এখানে?

তখন শিশু ছিলে, কোনো জাত ছিল না।

মঞ্জু খাবার নিয়ে এল। খেতে খেতে বললাম, তুমি এখন কোথায় থাক, ওসমান কাকা? তিনি বললেন, এইখানে নতুন বাড়ী করছি। করিম বড় হলে তারে দোকানে বাইখা দেশে চইলা আসব। বাংগালি কি থাকতে পারে বাংলাদেশ ছাইড়া?

খুড়িমা বললেন, তুমি বুঝি রাজগাঁ স্কুলে পড়ছ? আমি বললাম, পড়ছি কিন্তু বড়লোকের বাড়ী থাকতে ইচ্ছে করে না।

আর কতদিন লাগবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে?

বেশীদিন লাগবে না।

আমার খাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু পেট ভরল না। মঞ্জু সেটা বুঝে ফেলল ব'লে মনে হ'ল। মঞ্জুর জন্মের সময়

তার মা'র খুব অসুখ হয়েছিল ব'লে আমার সোনামাসীমার কাছে তাকে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সোনামাসীমাকে সে সোনামাসীমা ব'লে ডাকত, তাঁর কাছে প্রায়ই থাকত। তখন সে আমার খাওয়া দেখে আমাকে পেটুক বলত।

আমাকে শুতে দেওয়া হ'ল মঞ্জুর পড়ার ঘরটায়। খুব ক্লান্ত ছিলাম, শোবার সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মঞ্জু এসে আমার ঘুম ভেংগে দিল। উঠে দেখি আমার সামনে টেবিলের ওপর মাংস আর ভাত। অমনি বসে গেলাম খেতে। বললাম, তোমরা আজকাল মাংস খাও ?

আমি মা আর মাসীমা খাইনে, আর সবাই খায়।

খেতে ইচ্ছা করে না ?

নিজের পেট ভরার জন্য আরেকটা জীবকে মারব কেন ?

মাছ যে খাও ?

খাই নে তো।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি ওসমান-কাকা এর মধ্যেই বাজার ক'রে ফিরে এসেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে খুড়িমাকে প্রণাম ক'রে মা'র কাছে চললাম। কাকা একটা লোকের মাথায় এক ঝুরি ফল আর আমাদের জন্য কাপড় চোপড় দিয়ে তাকে আমার সংগে যেতে বলল। আমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, বৌঠানরে বলবা ঠ্যাকা কাজের জন্য নিজে গিয়া তাঁর সংগে দেখা করতে পারলাম না। দেশটার মধ্যে গুণ্ডা বদমাইসের রাজত্ব চলছে, সবসময় ব্যাটাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া

রাখতে হয়। পুলিশ ব্যাটারাই যত অনিষ্টের মূল, ওরাই গুণ্ডাদের ক্ষ্যাপাইয়া দেয়।

হায় রে আমার মুসলমান মারার স্বপ্ন। মনের মধ্যে পাশাপাশি ভেসে উঠল মামাবাড়ীর আর কাকার বাড়ীর ছবি দুখানি। একটি আত্মীয় স্বধর্মী ধনী পরিবার। আর একটি অনাত্মীয় বিধর্মী দরিদ্র পরিবার। আপন আর পর। আমি ওসমান-কাকাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আকুল হয়ে কেঁদে বলল, আল্লার দোহাই কাকা, ম্যাট্রিক পাশ কইরা আসাম চইলা যাইবা, আমার করিমের যদি পড়া হয় তবে তোমারও হইব।

বিকালবেলা বাবার মামাবাড়ী পৌঁছলাম। মাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। চেনাই যায় না তাঁকে। সুস্থ সবল দেহটি তাঁর শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তিনি অন্নাহার বর্জন করেছেন। সারাদিনের মধ্যে একবার মাত্র সামান্য কিছু মুখে দিয়ে থাকেন। আমার মনে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় রইল না যে ভগবানের আদেশ মতো মা ভগবানেরই কাছে চলেছেন। দারিদ্র্যের দরুণ স্বামীর ভিটা ছেড়ে অন্যত্র অন্ন গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

পুলিশের ভয়ে কেউ আমাদের চাইত না। অনেক অপমান সহ্য ক'রে পরের গলগ্রহ হয়ে মাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। এত অবহেলিত নিপীড়িত, তবু তাঁর চোখে মুখে এমন একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে যা সম্ভ্রান্ত পরিবারে সচরাচর দেখা যায়

না। আমি তাঁর তেজোদ্দীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রইলাম। বুঝলাম যতদিন মনের বল বজায় থাকে ততদিন দুঃখ দৈন্য সব তুচ্ছ। আমার ছোটভাই দুটি খবর পেয়ে কোথা থেকে যেন হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার চিরশুষ্ক চোখদুটাও ছলছল্ করে উঠল তাদের অসহায় চোখগুলি দেখে। বহু অযত্ন অসুবিধার ছায়া ফুটে উঠেছে তারমধ্যে।

রাত্রিটা কোনোমতে ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে পরদিন সকালে উঠেই ফিরে চললাম রাজগাঁয়ে। দুপুরবেলা মহেশপুরের খেয়াঘাটে বসে বিশ্রাম করছি, আমার ছোটবেলার বন্ধু কল্যাণ এসে বলল, তুমি এসে গেছ, সমীরদা! আমি জানতুম কংগ্রেসের বিপদের কথা শুনলে তুমি না এসে পারবে না।

কি বিপদ কংগ্রেসের ?

সত্যাগ্রহ যে বন্ধ হতে চলেছে।

আমি তো তোমাদের আন্দোলনে নেই।

কে বলছে তোমাকে থাকতে, তুমি শুধু আমাদের মানটা বাঁচিয়ে দাও। তোমাকে দেখলেই লোকের ভয় চলে যাবে, আবার ভলান্টিয়ার আসতে শুরু করবে।

কল্যাণের অনুরোধ আমি এড়াতে পারলাম না, ছোটবেলার বন্ধুত্বের সহস্র স্মৃতি মনে এসে আমার সকল আপত্তি নিঃশেষে মুছে দিল। আমি তার সংগে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম রাজগাঁ ফিরে গিয়ে আমার দশা কি হবে। এক অপরাধ করেছি তাদের না ব'লে ওসমান ব্যাপারীর বাড়ী গিয়ে, আবার চলেছি

গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে। হয়তো মামাবাড়ীতে থাকা আর রাজগাঁ স্কুলে পড়া দুইই বন্ধ হয়ে যাবে।

সত্যাগ্রহ শিবিরে এসে সকল উদ্বেগ ভুলে গেলাম। এতদিনে যেন জলের মাছ জলে এলাম। বিকালে মন্দিরের দরজায় পুলিশের প্রহারে জর্জরিত হয়ে জেলখানায় গেলাম। কংগ্রেস নেতারা আমাকে সাদরে বুকে তুলে নিলেন। কয়েকদিন পর সরকারী তদন্ত সুরু হ'লে সত্যাগ্রহ বন্ধ হ'ল। আমরাও মুক্তি পেলাম।

আট

বাড়ী ফিরে শুনলাম আমার কথা সবাই জেনে ফেলেছে। রুষ্ট হেডমাষ্টারবাবু আরও রুষ্ট হয়ে গেছেন। সবাইকে বিরূপ দেখে অসহায়ের সহায় প্রবোধদার কাছে গেলাম। দেখলাম সান্যালসাহেব আজও এসেছেন। প্রভাদি অন্য ঘরে বসে তাঁর সংগে গল্প করছেন, আর প্রবোধদা একা একা প্রভাদিকে পড়ানোর অপেক্ষায় বসে আছেন। প্রভাদিই কত কাকুতি মিনতি ক'রে প্রবোধদাকে বোর্ডিং ছাড়িয়ে এ-বাড়ীতে এনেছেন, এখন তাঁকে এরকমভাবে অবহেলা করছেন। বড়মামীমা আমাকে দেখে বললেন, এ কয়দিন কোথায় আড্ডা দিয়েছিস্ রে তুই? আমি বললাম, সত্যাগ্রহে গেছিলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে

তিনি বললেন, দাঁড়াও তোমাকে আমি এ বাড়ীতে থাকাচ্ছি। সান্ন্যালকে নিয়ে প্রভাদিও আমার কাছে এসে বললেন, ফের তুই না ব'লে কোথাও গেলে মজা দেখবি। সান্ন্যাল বললেন, আমি ভেবে পাইনে আপনাদের মতো কালচার্‌ড্‌ ফেমিলিতে এ বদছেলে এল কোথেকে। আমি নিঃশব্দে ফিরে গেলাম।

দুপুরবেলা আবার এলাম প্রবোধদার সংগে দেখা করতে। এসে যা দেখলাম তার কাছে নাটক নভেলও তুচ্ছ। দিনটা ছিল রবিবার। পুরুষদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছিল। মেয়েরা ব'সে গল্প ক'রে ক'রে খাচ্ছিলেন। প্রভাদি বৌদি মেজমামীমা বড়মামীমা সব। সান্ন্যালসাহেব কাছে ব'সে গল্প করছিলেন। প্রবোধদা এসে প্রভাদিকে বললেন, তোমার মডার্ণ-রিভিউর জরুরী লেখাটা আজই শেষ ক'রে ডাকে পাঠাতে হবে।

আজ হবে না। মিষ্টার সান্ন্যালদের ক্লাবের গানগুলি আজ ঠিক করব।

আজই পাঠাবার শেষ তারিখ, তোমার কথার ওপর নির্ভর ক'রে আমি তাঁদের কথা দিয়েছি।

তাহোক গে, আমার উঠতে একটু দেরী হবে।

এমন সব বাজে গল্প কর যা শিক্ষিত পরিবারে অচল।

প্রভাদি চুপ করে রইলেন, কিন্তু বৌদি বললেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পরিবারেই মেয়েরা একটু বাজে গল্প করে। প্রবোধদা বললেন, কই তোমার বোনেরা তো করে না। শুনে প্রভাদি কটমট করে তাকালেন। বৌদি বললেন, বড়রা না

করলেও ছোটরা করে, প্রভাদি তো ছেলেমানুষ। প্রবোধদা সবিস্ময়ে বললেন, বাইশ বছর বয়সেও ছেলেমানুষ ?

কিসের থেকে কি হয়ে গেল। প্রভাদির চোখের মধ্যে যেন আগুন খেলে গেল। হাতের গ্লাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উন্মত্তের মতো চীৎকার ক'রে বললেন, ছোটলোক বেইমান, যারটা খায় তারই নিন্দে করে। সব বাড়ীর মেয়েদের কীর্তিই আমার জানা আছে।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রভা করল কি ? তার পরম শুভার্থী শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু প্রবোধদার অভিসম্পাতকেও সে মনে করত আশীর্বাদ, তাঁকেই এমন অপমান করল সবার সামনে ! ধীমান চরিত্রবান প্রবোধদাকে কেউ কোনদিন কঠিন কথা বলে না, আর ছাত্রী হয়ে সে অকারণে অপমান করল তাঁকে ! কি ভেবে সান্যাল উঠে গেলেন সেখান থেকে। বড়মামীমা বললেন, চুপ করো প্রভা।

প্রভাদি বললেন, অভদ্রটা চলে যাক এখান থেকে ওর খাতিরের মেয়েদের কাছে। তাদের কেলেংকারী কে না জানে ?

প্রবোধদা ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। সন্ধ্যা-বৌদির মুখখানি মলিন হয়ে গেল। নিজের বোনদের অপবাদ শুনে তত নয়, যত অগ্রজতুল্য সদাশিব প্রবোধদার অপমান দেখে। ছোটদিদিমা বললেন, চুপ কর্ প্রভা, প্রবোধ তোর অনেক উপকার করেছে। প্রভাদি সেরকম ক্ষিপ্তভাবেই বললেন, আমি যে ওকে কতদিন রেষ্টুরেণ্টে খাইয়েছি, কত জিনিসপত্র কিনে

দিয়েছি। বড়মামীমা বললেন, উপকার সে যা করেছে তা কেটে গেছে তার অপকার দিয়ে।

ছোটদিদিমা জিগগেস করলেন, কি অপকার করেছে সে?

বড়মামীমা উত্তর দিলেন, মিষ্টার সান্ন্যাল যে আমাদের বাড়ী আসেন তা সে চায় না, তাই সমীরকে পাঠিয়েছিল সত্যাগ্রহ করতে।

ছোটদিদিমা বললেন, সে আবার কি?

বড়মামীমা বললেন, স্বদেশীওয়ালাদের বাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট অফিসার আসতে পারে কখনও?

প্রভাদি বললেন, অভদ্রটা পড়াবার ছল ক'রে আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়।

ছোটদিদিমা বললেন, এসব কথা তোকে সান্ন্যাল বলেছে?

বারীন বলল, দিদি সান্ন্যালকে বলেছিল ওর বয়স উনিশ।

প্রভাদি হুংকার দিলেন, চুপ কর হারামজাদা, মিষ্টার সান্ন্যাল তোর প্রবোধদার চেয়ে অনেক রিফাইণ্ড্ লোক।

প্রবোধদা বললেন, তোমার লেখাটা এখন শেষ করে ফেল, আমি বিকালে চলে যাই।

না, লেখার ছুতো ক'রে আপনাকে থাকতে হবে না, আমাকে ষ্টেপিং-ষ্টোন ক'রে সমাজে নাম কিনতেও হবে না।

কোথায় আবার তোমাকে ষ্টেপিং-ষ্টোন করলাম?

মিষ্টার সান্ন্যাল আমার কাছে আসেন, আপনি কেন আপনার কাহিনী বলতে যান তাঁর সংগে?

সে তো আমারই পুরনো বন্ধু, আমি তাকে তোমাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি ব'লেই না সে আসে?

বাজে কথা, আমি লোককে চার্ম করি আমার ব্যবহারে, তাই তাঁরা আসেন আমার কাছে।

এই নগ্ন ধৃষ্ট কথাবার্তায় সকলে আবার স্তম্ভিত হয়ে গেল। বৌদির চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। মেজমামীমা আর সইতে না পেরে উঠে গেলেন। আমি কয়েকটি জিনিস শিখলাম। এক মেয়ের কাছে আরেক মেয়ের, বিশেষ ক'রে ননদের কাছে বৌদির বোনের প্রশংসা করতে নেই। কোনো মেয়ের সামনে তার ঠিক বয়সটা বলতে নেই। ক্ষণিকের খাতিরে ভুলে কারও পরিবারে এসে বাস করতে নেই। মেয়েদের ভালবাসার ওপর নির্ভর করতে নেই।

প্রবোধদার শান্ত সৌম্য সংযত মুখখানির দিকে চাইতে বড় কষ্ট হ'ল। প্রভাদির যে-যশ বিদ্যার জন্যে এত লোক তাঁর কাছে আসে তার মূলেই যে আছেন তিনি। এত অহংকার করতেন প্রভাদিকে নিয়ে, আজ সবাই তাঁকে বলবে কি?

বিকালবেলা প্রবোধদা স্কুলের বোর্ডিংয়ে চ'লে গেলেন। এত আপন মনে ক'রে যাঁর ভালর জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁরই বাড়ী থেকে তিনি হতভাগার মতো একা একা আপনমনে চ'লে গেলেন, বিদায় দিতে কেউ এল না।

মামাবাড়ীটা যেন খালি হয়ে গেল। সবাই প্রবোধদার অভাবটা অনুভব করতে লাগল। ঝি চাকর পর্যন্ত তাঁর জন্য আক্ষেপ

করতে লাগল। ছেলেপিলেরা এমন কি বারীনও মন-মরা হয়ে রইল। বড়দা বলতেন মানুষের মনে ব্যথা দেওয়া যায় দুভাবে—অহংকারে আঘাত ক'রে, আর আত্মাকে আঘাত ক'রে। কারও যশকে খর্ব করলে সে পায় অহংকারে আঘাত, তার ব্যথা অগভীর ও অস্থায়ী। কিন্তু কারও বিশ্বাসকে অপমান করলে সে পায় আত্মায় আঘাত, এর ব্যথা গভীর ও স্থায়ী। প্রভাদি এই আঘাত করেছেন প্রবোধদাকে। প্রবোধদার ভদ্র অন্তঃকরণ কোনো গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দিয়ে তাঁকে জব্দ করবে না একথা নিশ্চিত জেনেই তিনি সাহস করেছেন প্রবোধদাকে এত কথা বলতে। আমার পরমাত্মীয়টি চিরতরে বিদায় নিলেন। আমার এমন বিপদের দিনে কাছে রইলেন না।

বিপদের ওপর আবার বিপদ। একদিন স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম ছেলেমানুষের কান্না শুনে। চাষী ইউসুফের বারবছরের ছেলে নসু পথের ধারে গরু চরাচ্ছিল। স্কুলের সেক্রেটারী অবসরপ্রাপ্ত জজ দোর্দণ্ড-প্রতাপ চন্দ্রবাবু যাচ্ছিলেন সেপথ দিয়ে। কিক'রে গরুর ল্যাজটা লেগে তাঁর জামাটা একটু নোংরা হয়ে গেছিল। তিনি নির্মমভাবে সেই ছোট্ট ছেলেটাকে মারছিলেন। ছেলেটা তাঁর পায়ে ধরে আর্তনাদ করছিল। আমি সে করুণ দৃশ্য আর সইতে না পেরে ছুটে গিয়ে চন্দ্রবাবুকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে উদ্ধার করলাম। আমার দানবের মতো চেহারাটার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে

থেকে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে জজবাবু চলে গেলেন। উপস্থিত সকলেই আমাকে গালাগালি করতে লাগল। থানার দারোগা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিও বললেন আমার অপরাধ হয়েছে। ইউসুফও এসে পিটতে লাগল তার ছেলে নসুকেই। এসব দেখে আমারও মনে হ'ল আমিই হয়তো অন্যায় ক'রে ফেলেছি। একে জমিদার, তাতে জজ, তার গায়ে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি।

হঠাৎ পাশের লোকগুলি সব ছুটাছুটি ক'রে সরে পড়ল। হুংকার শুনে চেয়ে দেখলাম জমিদার বাড়ীর দারোয়ান বিখ্যাত দাংগাবাজ ইয়াকুব সর্দার কয়েকজন লেঠেল অনুচরসহ আমার দিকে ছুটে আসছে। ভয় হল খুব, তাই ব'লে পালিয়ে যেতে পারলাম না কিছুতেই। ইয়াকুব এসেই বিশ্রী একটা গালি দিয়ে আমার মাথার মধ্যে মারল এক গুঁতো। রাগে আমার কাণ্ডজ্ঞান রইল না। হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে পাগলের মতো ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলাম। লোকগুলি লাঠি সোঁটা ফেলে দিয়ে আর্তনাদ ক'রে পালিয়ে গেল। আমি নিকটবর্তী একটা গাছের ছায়ায় বসে হাঁপাতে লাগলাম। মাথা থেকে অবিরলধারে রক্ত পড়তে লাগল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল। সূর্য ডুবতে চলল। আমি সেখানেই বসে রইলাম। চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। আঘাতের ব্যথায় নয়, অবিচারের অপমানে। স্কুলের দপ্তরী আমার মামাবাড়ীর দিক থেকে আসছিল, বলল হেডমাষ্টার ঠিক করেছেন আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। সে-খবর

দিতে সে আমার দাদুর কাছে গেছিল। এখন বোর্ডের মিটিংয়ে তাড়ানোর প্রস্তাবটা পাশ হলেই হয়। এতকালের এত আশা ভরসা সবকিছু আমার শেষ হয়ে গেল নিজের খামখেয়ালির জন্য। স্কুলে পড়াও শেষ, মামাবাড়ী থাকাও শেষ। জীবন কাটাতে হবে দিনমজুরি ক'রে। স্বাধীনতা যুদ্ধেও আমার স্থান হবে খুব নীচে।

প্রবোধদা আর গৌরদা এসে আমার পাশে বসলেন। গৌরদা জল ন্যাকড়া দিয়ে ঘা-টা পরিষ্কার করতে লাগল। প্রবোধদা আমার পিঠে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই, ভাই।

আমি বললাম, সবাই কেন জজকে সমর্থন করল, প্রবোধদা?

টাকার প্রতি দাসত্বের জন্য।

টাকাওলারা তো আর অমনি অমনি টাকা দেয় না কাউকে।

মজা তো এখানেই। বিত্তশালীর কাছে মাথা নত করার মধ্যে মানুষ একটা সুখের আস্বাদ পায়। সাধারণ লোকের কাছে বেশী বেতন পেয়েও যে চাকর অতৃপ্ত থাকে, বড়লোকের বাড়ীতে অল্প বেতনে কাজ করেও সে তৃপ্তি পায়। মানুষের এই স্বভাবেরই ওপর টিকে আছে ধনিকসভ্যতা।

কেন?

সম্পদগ্রস্তের সংগে সম্পদবঞ্চিতের বিভেদ মানুষের মনকে ক'রে ফেলেছে রুগ্ন। আজ রক্তের আল্পনায় তোমার দীক্ষা হয়ে যাক বিভেদবিনাশী মহাসাম্যের মন্ত্রে।

বঞ্চিতদের পক্ষ নিয়ে আমি জীবনভর সংগ্রাম করব।

না, তুমি সংগ্রাম করবে মনুষ্যত্বের পক্ষ নিয়ে। সম্পদগ্রস্ত সম্পদবঞ্চিত দুয়েরই বুদ্ধি অসুস্থ, দুইই সাম্যবিরোধী হয়ে নিজেকে সম্পদভারাক্রান্ত করতে চায়। তুমি তোমার সুস্থ বুদ্ধি নিয়ে এমন এক সমাজ সৃষ্টি করবে যেখানে সম্পদহীনতা সম্পদাতিশয্য কিছুই থাকবে না। সম্পদ হবে মানুষের দাস, মানুষ সম্পদের নয়।

আমি জিগগেস করলাম, কোন্ পথে সম্ভব সেটা ?

বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থার পথে।

বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা কাকে বলে ?

বর্তমান ব্যবস্থাকে বলে কেন্দ্রিত ব্যবস্থা। বিরাট দেশটাকে সুদূর রাজধানী-কেন্দ্রের অধীনে রাখা হয়েছে। এটাকে বহু কেন্দ্রের অধীনে রাখতে হবে।

কেন ?

এক কেন্দ্রের অধীনে বহু লোক থাকলে তারা মুষ্টিমেয় কেন্দ্রকর্তাদের চাপে পিষ্ট হয়ে মরে। তাদের অনেকগুলি ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে দিলে মুষ্টিমেয় লোক আর তাদের পেষণ করার সুযোগ পায় না।

কেন্দ্রিত ব্যবস্থা যদি গণতান্ত্রিক আর সাম্যবাদী হয় ?

তাহলেও জনতা শোষিত হবে মুষ্টিমেয়ের হাতে। স্বাধীনতা অবস্থান করবে কাগজপত্রে। কারণ কেন্দ্রিত শাসনযন্ত্রের ধর্মই হচ্ছে বহুর শোষণে স্বল্পের স্ফুটন। মনীষী মার্কসও তাই চেয়েছিলেন কেন্দ্রিত ব্যবস্থাকে তুলে দিতে।

প্রবোধদার কথা শুনতে শুনতে আমি ব্যথা বেদনা ভুলে গেলাম। ইচ্ছে হ'ল আরও অনেক কিছু জেনে নিই। কিন্তু কি একটা জরুরী কাজে তিনি চলে গেলেন। গৌরদা বলল, তোমাকে নাকি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে, তাহলে তোমার পড়ার কি হবে? আজকাল বন্ধুত্ব বৃদ্ধির সংগে সংগে আমরা একজন আরেকজনকে 'তুমি' সম্বোধন করতাম। আমি বললাম, মাসীমা ফিরে এলে একটা ব্যবস্থা হবে।

কোন্ মাসীমা?

চাঁপামাসীমা?

ওঃ।

কেন তোমার বিশ্বাস হয় না?

তোর মতো ভালমানুষকে মেয়েরা পেয়ে বসবে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিগগেস করলাম, কেন?

মেয়েদের ওপর যাদের অচলা ভক্তি তাদেরই ক্ষতি তারা করে। যে পুরুষ ওদের ঘেন্না করে সে-ই ওদের নিয়ে শান্তি পায়।

তুমি বাজে কথা বলো না।

গৌরদা বলল, মেয়েরা নিজেদের মনে করে বাজারের জিনিস, যে ওদের বেশী দাম দেবে তার কাছে আরও বেশী দাম চাইবে, নানারকম ছলা কলা করবে।

আমি গৌরদার কথা ভাল না বুঝলেও ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। তার সকল উপকার ভুলে গিয়ে বললাম, তুমি আর আমার সংগে কথা বলো না। ব'লেই উঠে চলে এলাম

সেখান থেকে। গৌরদার নাম গৌরাংগ হলেও চেহারাটা ছিল বড় কুশ্রী এজন্য এতদিন বড় দুঃখ ছিল আমার মনে। আজ মনে হ'ল তার কুশ্রী মনের সংগে বেশ মিল আছে তার কুশ্রী চেহারাটার। সে শহর থেকে রোজ পড়তে আসে, লোকে তার সম্বন্ধে কতকিছু খারাপ সন্দেহ করে, আজ মনে হ'ল সেসব সত্যি।

নানারকম ভয়াবহ কল্পনা করতে করতে এসে জংগলের ভাংগা মন্দিরটাতে বসলাম। নিরালা এই জায়গাটায় এসে বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। সম্মুখে অবলুণ্ঠিত জগদ্ধাত্রী মূর্তিটি আমার কানে কানে যেন বলতে থাকে বিগত দিনের কত বিস্মৃত কাহিনী। কি আনন্দময় ছিল সে সব দিনগুলি! বিলাস-ব্যসন অনুষ্ঠান-আড়ম্বরের প্রাচীর তখন ঘিরে থাকত না মানুষের হৃদয় শতদলকে। পল্লীর শান্ত সহজ পরিবেশে অনায়াসে একে পেত অপরের অন্তরের সহজ পরিচয়টি। দিগদিগন্ত থেকে পল্লীবাসীরা এসে মিলিত হ'ত মন্দিরের প্রাংগণে, বিশ্বাস-সমাকুল হৃদয়ে নিবেদন ক'রে যেত কর্মক্লান্ত দিবসের শেষসঞ্চয়টুকু। পুরোহিত সে প্রসাদ বিতরণ ক'রে দিতেন অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। তারপর এল যুগান্তরের প্রলয়-ঝঞ্ঝা, পাল্টে দিল সমাজব্যবস্থা। ধ্বংস হয়ে গেল পল্লীসমাজ, বিধ্বস্ত হ'ল মন্দির-কেন্দ্রিক বিতরণ ব্যবস্থা। দেখা দিল শহর। পল্লীর কষ্টার্জিত ধনরত্ন গিয়ে সঞ্চিত হতে লাগল সে সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে। হাহাকার উঠল পল্লীর ঘরে ঘরে।

ব্যথাহত হৃদয় আমার উন্মুখ হয়ে উঠল মর্মভেদী সে-হাহাকার দূর করতে, প্রতিষ্ঠা করতে ন্যায় ও সাম্যের রাজত্ব। আসুক বিপদ, আসুক পীড়ন, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব দুঃখ-সাগরে। আমার ব্যথার সংগে সুর মিলিয়ে বনদেবীর কণ্ঠে যেন বেজে উঠল কার জয়গান ঃ

এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে,
ঘোর বিপদ মাঝে কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস.
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস।

বিস্ময়ে আনন্দে নিস্তব্ধ হয়ে আমি চেয়ে রইলাম চাঁপামাসীমার স্নেহস্নিগ্ধ হৃদয়-দোলানো চাহনির দিকে। কমনীয় কণ্ঠে গাইতে গাইতে কোমল বাহুলতা দুটি দিয়ে তিনি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এমন আনন্দের মধ্যেও কেমন একটু বিব্রত বোধ করলাম। একটা অস্বস্তিতে শরীরটা কেঁপে উঠল। কিছুদিন থেকে আমার মধ্যে একটা বর্ণনাতীত বিপ্লব বয়ে গেছে। শরীরটা অনেকখানি বেড়ে গেছে, গলার স্বরটা হয়ে গেছে মোটা ভারি, মনের মধ্যে অনুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কত সব রোমাঞ্চময় স্বপ্ন। চারদিকের কোনো কিছুই আর মনে হয় না আগের মতো গতানুগতিক। সবকিছুর মধ্যে একটা নতুন অর্থের সন্ধান পেয়ে

হৃদয় আমার আকুল উন্মুখ হয়ে ওঠে কার কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে। মেয়েমানুষকে আর আমি আগের মতো সহজভাবে দেখতে পারি নে, তাদের ছোঁয়া গায়ে লাগলে দেহ মন আমার ভরে উঠে কতসব অদ্ভুত অনুভূতিতে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট খারাপ, মাসীমা মনে করেন আমি এখনও রয়ে গেছি আগের ছোট্ট সমীরটি। তাই আমাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেই বললেন, বাব্বা, কত খুঁজে বের করেছি তোমাকে।

আমাকে নীরব দেখে মাসীমা ঘুরে এসে আমার সামনে বসলেন। এতদিন পরে তাঁকে পেয়ে আমি অকূল সমুদ্রে কূল পেলাম। অনেক কষ্টে আনন্দোচ্ছ্বাস চেপে বললাম, তুমি কখন এলে, মাসীমা?

অনেকক্ষণ।

আসতে এত দেরী করলে যে?

কাকার অসুখ সারলে তবে তো আসব।

চিঠি দাওনি কেন?

আমি তবু তিনটে দিয়েছি, তুমি একটাও দাওনি কেন?

চিঠি দেওয়ার জন্য টিকিট কিনে রেখে দিয়েছি, তুমি না এলে দিতাম। রোজ ডাকবিলির সময় ডাকঘরে গিয়ে পিয়নের কাছে বসে থাকতাম তোমার চিঠির আশায়।

বাজে কথা, তুমি মনে কর মেয়েদের চিঠি পড়লে পাপ হয়, তাদের গায়ের ছোঁয়া লাগলে স্নান করতে হয়।

নয়

অনেকরাত্রে অন্ধকারে চুপিচুপি আমার ঘরে এসে দেখলাম মাসীমা এরমধ্যেই সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরের চেহারা পাল্‌টিয়ে ফেলেছেন। হাতের মধ্যে যেন তাঁর যাদু আছে। মেজমামীমা মাবাপ-মরা ছোটবোনটিকে নিজের মতো ক'রে তৈরি করেছেন।

মাসীমা এসে পাশে পড়তে বসে বললেন, কি হবে?

কিসের?

তোমার পড়ার।

পড়ব না, দোকানে কাজ করব।

এলাহাবাদে গিয়ে আমার কাকার বাসায় থেকে পড়।

না, বড়লোকের বাসায় আর থাকব না, পড়বও না।

তাহলে আমার হারটা নিয়ে বিক্রী ক'রে অন্য কোথাও থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দাও।

বলছি পড়ব না, তবু প্যান্‌প্যান্ করছ।

মাসীমা বিষণ্নমুখে লেখাপড়া করতে লাগলেন। পরে আবার বললেন, প্রভার সংগে চন্দ্রবাবুর খুব আলাপ পরিচয় আছে, ওর অনুরোধে তিনি হয়তো তোমাকে মাপ করবেন।

প্রভাদির কাছ থেকে কোনো সাহায্য আমি নেব না।

তুমি প্রভাকে যত খারাপ মনে কর তত খারাপ সে নয়। রাগ জেদ একটু বেশী বটে, কিন্তু ওর মতো সত্যপরায়ণ

উদারপ্রাণ মেয়ে আমি কম দেখেছি। প্রবোধদার সংগে একটা দুর্ব্যবহার করে ফেলেছে ব'লে গুণগুলি তো আর উড়ে যায়নি।

একজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন ক'রে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়ে তারপর যে তাঁকে খোঁটা দেয় তাকে তোমাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারে উদার বলতে পারে, আমরা বলিনে, মাসীমা।

সেতো আর টাকার শোকে করেনি, করেছে তাঁকে জব্দ করার জন্য।

তারই ভালর জন্য যেসব গোপন কথা তাকে বলেছিলেন তাও সে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। মানুষ ভালবেসে বন্ধুর কাছে মনের অনেক কথা বলে, ভালবাসা ভেংগে গেলে পর যে-লোক সেকথা অন্যের কাছে প্রকাশ ক'রে দেয় তার মতো লোকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আমি নিতে পারব না।

এর আসল্ কারণটা আঁচ করতে পারলে তুমি এতটা রাগ করতে না প্রভার ওপর। মেয়েরা পুরুষের সবল চরিত্রকে যেমন পছন্দ করে, তেমন তাকে বশীভূত করার মধ্যেও একটা আনন্দ পায়। প্রবোধদাকেও সে চাইত তার কাছে বশীভূত করতে। তা না পেরেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল।

ওসব কিছুই নয়। প্রবোধদাকে না তাড়ালে সান্ন্যাল সন্তুষ্ট হয় না তাই একটা ছুতো করে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

তারও যথেষ্ট কারণ আছে। প্রভা ছোটবেলা থেকে শিখেছে ইংরেজের অনুকরণ করতে। যে ইংরেজের যত বেশী কাছাকাছি তাকেই মনে করেছে তত বেশী বড়মানুষ। মিষ্টার সান্ন্যালের রং

শাদা, চুল লাল, চোখ কটা, চাকরি গেজেটেড্। সারাক্ষণ সে প্রভার প্রশংসা করে। কিন্তু প্রবোধদার মুখ থেকে সে কখনও শুনতে পেত না মিথ্যে প্রশংসা। তাই তার এই মোহ। তবে থাকবে না বেশী দিন।

একজনের তো অনিষ্ট হ'ল, পরে মোহ থাকা না থাকা সমান।

আবার মিল হয়ে যাবে।

অসম্ভব।

আমি যদি তোমার সংগে এরকম ব্যবহার করি তাহলে তুমিও কি আমায় ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের মতো।

তুমি করবেই না এরকম ব্যবহার।

ভুল সবারই হতে পারে। ব'লে মাসীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু পরে বললেন, চলো যাই স্কুল ঘরে।

কেন ?

মেয়েদের কাল পরীক্ষা, সিটগুলি ঠিক করতে হবে।

নিঝুম নিশ্চুপ দুপুররাত্রে সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে মেয়েদের নাম লিখে বেঞ্চির ওপর সেঁটে দিতে লাগলাম। আমি বললাম, আমাদের পার্টির জন্য সে-গানটা লিখে দেবে না ?

আজ রাত হয়ে গেছে, কাল সকালে এখানে এসে নিয়ে যেয়ো।

তুমি মেয়েদের পরীক্ষার সামনে থাকবে না তখন ?

ওরা পরীক্ষা দেবে, আমাকে কেন সামনে থাকতে হবে ?

নকল করবে না ?

না।

এত ভাল তোমার মেয়েরা ?

ভাল নয়, হিংসুটে। একজন একটু নকল করলে অন্য মেয়েরা শেয়ালের মতো চীৎকার ক'রে ওঠে।

সে তো ভাল।

ছাই ভাল। ওদের কত বলি, দেখ ছেলেদের মধ্যে কত একতা, একজন নকল করলে অন্য ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার দোষ ঢাকার জন্য।

তাহলে কাল দেবে ?

দেব, কিন্তু তুমি বিপ্লবী দল ছেড়ে দাও।

কেন ?

সন্ত্রাসবাদীরা চায় ইংরেজকে মারপিট করে তাড়াতে।

মারপিট না করলে ইংরেজ যাবে না, ইংরেজ না গেলে সাম্যবাদ আনা যাবে না।

কেন, মার্ক্সিষ্ট দলও তো চায় সাম্যবাদ আনতে।

তারা চায় অন্য পার্টিরা ইংরেজদের তাড়াবে, আর তারা ক্ষমতা দখল করে রাজত্ব করবে, এসব চালাকি দিয়ে বড় কাজ হয় না।

মাসীমা বললেন, আমিও যোগ দেব তোমার দলে।

না।

কেন ?

মেয়েমানুষ দিয়ে বিপ্লব হয় না।

মেয়েমানুষকে এত ঘৃণা কর কেন তুমি ?

সত্যি কথা বললে বুঝি ঘৃণা করা হয়?

মেয়েরা কি কোনো কাজই করতে পারে না?

পারবে না কেন, বিপ্লব করতে পারে না। বিপ্লব মানে অশান্তি, আর মেয়েরা হচ্ছে শান্তির প্রতীক।

আমরা তো শান্তির জন্যই অশান্তি করব।

তা হয় না।

কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে চললাম। পুকুরপাড়ে আসতেই মাসীমা জোৎস্নামণ্ডিত ঘাসের ওপর নিজে বসে প'ড়ে আমাকেও টেনে বসালেন। কবিমন তাঁর বিমুগ্ধ হয়ে গেল প্রকৃতির অনুপম শোভা দেখে। তন্ময় হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমার জীবনের আদর্শ মানুষ কে, সমীর?

আমার জীবনকেই উন্নত ক'রে আদর্শ মানুষ ক'রে তুলব।

কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে করবে?

বহু লোকের।

কাকে তোমার মনে হয় সবচেয়ে যোগ্য?

স্বামী বিবেকানন্দকে।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে স্বামীজির উদ্দেশে প্রণাম ক'রে মাসীমা বললেন, ঠিক বলেছ, স্বামীজিই হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। প্রবোধদা বলেন বেদান্তবাদ এবং মানববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে স্বামীজি জগতকে সাম্যবাদের নূতন পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু সেপথে চলতে গেলে তোমাকে দেখাশোনা করবে কে?

দেখাশোনা করতে হবে কেন আমাকে ?

তুমি আপন-ভোলা উদাসী মানুষ, ভয় হয় একজন যত্ন করার লোকের অভাবে তোমার মহৎ সাধনা পণ্ড হয়ে যাবে। যদিও বা লোক মেলে সে হয়তো তোমার আদর্শকে পছন্দ করবে না। সমীর, পরজন্মেও কি মানুষ পায় পূর্বজন্মের প্রিয়জনকে ?

কিসের মধ্যে কি কথা, আমি জানব কিক'রে এসব ?

তুমি জান, বল।

পূর্বজন্মে মন যাকে চায় তাকে পরজন্মে যদি না চায় ?

চাইলে পাবে কি না বল।

হয়তো পাবে।

মরলেই কি সব শেষ হয়, সমীর ?

বোধহয় না।

পরজন্মে আমি তোমার কী হব ?

মা হলে বেশ হয়।

না বোন হব।

তাও বেশ হবে।

মাসীমা বললেন, তাহলে মরতে ভয় কি ? আমি বললাম, ভয় পাবে না তুমি মরতে ? তিনি বললেন, না।

এখন যদি যম এসে বলে 'চলো', পারবে তুমি যেতে ?

খু-উ-উব।

ধপ্ পাস্! ভীষণ শব্দে পাশের ঝোপের মধ্যে একটা তাল পড়ল তালগাছটা থেকে। আমি চকিতে উঠে দাঁড়াতেই,

'মাগো' ব'লে মাসীমাও উঠে এসে আমার বুকে লুকোলেন। আমার পৌণে ছ'ফুট দীর্ঘ দেহের প্রশস্ত বুকে তাঁকে মনে হ'ল যেন ছোট্ট বোনটি। সজোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কিছু না, একটা তাল পড়েছে। আমার কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে এদিক ওদিক চেয়ে তিনি বললেন, আমি সত্যি বড় ভীতু, একা একেবারেই থাকতে পারিনে। পরজন্মে তুমি হবে বড়ভাই, আমি হব ছোটবোন। আমি থাকব চাঁপাগাছে ফুল হয়ে, সমীর হয়ে তুমি দেবে দুলিয়ে দুলিয়ে। কেমন বিমনা হয়ে কার উদ্দেশে যেন মাসীমা এসব কথা বললেন। উদাস নিশ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জ্যোৎস্নাহসিত আকাশ পানে, মন তাঁর চলে গেল কোন্ সুদূর সিন্ধুপারের আহ্বানে। অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত সে মুখপানে চেয়ে চেয়ে আমিও যেন ভেসে চলে গেলাম কোন্ স্বপ্নলোকে। মিথ্যা হয়ে গেল সমাজ সংসার, চূর্ণিত হয়ে গেল যত বিঘ্ন-বাধার প্রাকার।

দশ

একদিন অনেকরাত্রে পড়তে বসে গৌরদার কথা ভাবছিলাম। বিপ্লবীদের কাছ থেকে একটা গোপন খবর শুনে মনটা তার ওপর বিরূপ হয়ে গেছিল। সে নাকি কুলিগিরি করত, এখন নাম ভাঁড়িয়ে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে এ স্কুলে পড়ছে।

কুলোকটার জন্য মনে বড় ঘেন্না হতে লাগল। এমনসময় পূবদিকের বাগানটাতে শোনা গেল তিনটে পেঁচার ডাক। আমি বেরিয়ে সেখানে চলে গেলাম। পূবদিকের খালের ওপারে ঘন হোগলাপাতার বনের মধ্যে মাটির নীচে একটা প্রাচীন ভাংগা কেল্লা ছিল। সাপ বাঘের ভয়ে কেউ যেত না সেদিকে, কেল্লার খবরও বিশেষ রাখত না। গৌরের সংগে সেখানে গেলাম।

কেলার একটা ঘর ছিল বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার। সমিতির বিশিষ্ট কর্মীগণ এখানে সমবেত হয়েছিলেন। প্রবোধদা সকলকে উদ্দেশ করে বললেন: কংগ্রেস শিগগিরই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। তখন আমরা শুরু করব সশস্ত্র কর্মধারা। নইলে কংগ্রেসের আন্দোলন টিকতে পারবে না। লণ্ডন থেকে আমাদের হেডাফিসে খবর এসেছে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করলে গভর্ণমেণ্ট ভীষণ অত্যাচার করবে। আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে তারা কংগ্রেসের নিরস্ত্র ভলাণ্টিয়ারদের ছেড়ে দিয়ে অত্যাচার শুরু করবে আমাদের ওপর। পৃথিবীর লোকও তখন বুঝবে ভারতবাসী অহিংস সংগ্রাম করে নীতির বশবর্তী হয়ে, সহিংস সংগ্রামের ভয়ে নয়।

জিগগেস করলাম, মার্ক্সিষ্টরা এতে মত দেবে?

না, দেবে না। তারা কংগ্রেসকে বড় হতে দিতে চায় না। বরং চায় ভলাণ্টিয়ার হয়ে ঢুকে আন্দোলনটাকে নষ্ট করতে।

আমি বললাম, কংগ্রেসেও স্বার্থান্বেষী লোক আছে তো? আমার কথার জবাব না দিয়ে প্রবোধদা সভার অন্য কাজে

মন দিলেন। আমি আমার একটা প্রস্তাব তাঁর হাতে দিলে তিনি সেটা দেখে সবাইকে বললেন, সমীর রায় প্রস্তাব এনেছেন কোনো কর্মী মিথ্যাচার করবে না। মিথ্যাচার করে ভয় থেকে, কিন্তু ভয় যাদের মধ্যে আছে তারা কখনও পারে না বড় কাজ করতে। আপনাদের কি মত ?

একজন বললেন, এতবড় শক্তিমান গভর্মেণ্টকে ভয় করব না, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কি করব ?

আমি বললাম, হয় সত্যি কথা বলব, নয় চুপ করে থাকব।

একজন বড় কর্মীর সাজা হয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হবে না ?

না, বড় কাজের জন্য বুক পেতে সাজা নিলে তাঁর পিছনে গড়ে উঠবে সহস্র সহস্র সত্যনিষ্ঠ সাহসী মুক্তিসেনা, মিথ্যাচারী হয়ে মুক্তি নিলে তা দেখে সহস্র সহস্র লোক হয়ে যাবে মিথ্যাবাদী কাপুরুষ। তারা কোনোদিন পারবে না স্বাধীনতা আনতে, ঘটনাচক্রে পারলেও জোচ্চোরে দেশ ভরে যাবে। আজ যারা গভর্ণমেণ্টের সংগে মিথ্যেকথা বলছে কাল তারা আমাদের সংগে মিথ্যেকথা বললে ঠেকাবার কোনো পথ থাকবে না।

আমার কথা শুনে বিপ্লবীরা ক্ষেপে গেলেন। আমাকে তাঁরা বিদ্রোহী মনে করলেন। প্রবোধদা বললেন, সমীর চায় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনেও আমাদের প্রার্থীর জন্য কোনো মিথ্যা প্রচার করা হবে না।

একজন বিপ্লবী বললেন, কংগ্রেস মার্ক্সিষ্ট-পার্টি সবাই মিথ্যে প্রচার করবে, আমরা না করলে জিততে পারব না।

আমি বললাম, মিথ্যার আশ্রয় নিলে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হবে, তারমধ্যে আমি থাকব না।

প্রবোধদা বললেন, বিদ্রোহী হ'লে তোমাকে পার্টি ছাড়তে হবে।

সেই বিপ্লবীটি বললেন, গৌরাংগকেও ছাড়তে হবে, খবর পেয়েছি সে দুর্নীতিপরায়ণ।

প্রবোধদা বললেন, আজই ছাড়তে হবে, স্কুল থেকেও চলে যেতে হবে।

গৌর মলিন মুখে প্রবোধদাকে প্রণাম ক'রে চলে গেল। আমার মনে হ'ল উচিত শাস্তিই হয়েছে। একটা মূর্খ লোক স্কুলের ওপরের ক্লাশে পড়তে এসেছিল, ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু আমাকেও ছাড়িয়ে দেবে সেকথা ভাবতেই আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাল দাদু বাড়ী এসে আমার কথা শুনে কি করবেন তার ঠিক নেই। কালই আবার স্কুলের মিটিংয়ে আমাকে তাড়ানোর প্রস্তাবটা পাশ হবে। আজ আমার একান্ত অন্তরংগ বন্ধুরা এমন ক্রুদ্ধ হলেন আমার ওপর।

ঘরে ফিরতেই মাসীমা বললেন. না ব'লে কোথায় যাও ?

কিক'রে বুঝব তুমি আবার খুঁজতে আসবে ?

খেতে বস।

খেতে দিতে দিতে মাসীমা বললেন, কালই তো সব শেষ হয়ে যাবে, তারপর কি করবে ?

কলকাতা গিয়ে কাপড়ের দোকানে কাজ করব।

কাপড়ের দোকানে কাজ ক'রে পড়া যাবে না।

তাহলে বইয়ের দোকানে কাজ করব।

অতবড় শহর, কোনোদিন যাওনি, কেউ তোমাকে চেনে না, হঠাৎ গিয়ে শেষে একটা বিপদে পড়বে।

মাসীমা শুতে চলে গেলেন। কাল কি হবে তা ভেবে আমার চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। অন্যদিন ঘুম না এলে মনে হয় রাতটা ফুরুচ্ছে না, আজ মনে হ'ল রাতটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এই সময় কাটা না কাটা ব্যাপারটা। হঠাৎ মনে হয় সময়টা বাইরের জিনিস। চোখ দিয়ে যেমন কিছু দেখি, কাণ দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে শুঁকি, তেমনি মন দিয়ে সময়টা অনুভব করি। কিন্তু কাজের বেলা দেখা যায় সময়ের সংগে মানুষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। যখন আমার মন চায় সময়টা ধীরে ধীরে কাটুক, তখন সময় চলে তাড়াতাড়ি। যখন মন চায় তাড়াতাড়ি কাটুক, তখন সে চলে ধীরে ধীরে। ঘড়ির মাপের একই পরিমাণ সময় কখনও মনে হয় দীর্ঘ, কখনও মনে হয় স্বল্প।

সকালবেলা কেউ ঘুম থেকে না উঠতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। স্কুল থেকে শেষ খবরটা শুনে চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়। পুকুরের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সদ্যস্নাতা সিক্তকুন্তলা মাসীমা বাগানের মধ্যে ফুল তুলছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না এমন না ব'লে আমি চিরদিনের মতো চলে যাব। তাড়াতাড়ি চলে এলাম অন্য পথে। যাওয়ার বিঘ্ন ঘটবে ভেবে প্রণাম করেও যেতে পারলাম না আমার পরম শুভার্থিণী মাতৃরূপিণী মাসীমাকে।

সময়মতো স্কুলে গেলাম। ভয়ে ভয়ে গিয়ে পিছনের বেঞ্চে আমার জায়গাটিতে বসলাম। ছল্‌ছল্‌ চোখে গৌর আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কথা বলতে পারে না। ক্লাশে টিচার এলেন, স্কুল বসে গেল। ওদিকে হেডমাষ্টারের ঘরে মিটিং বসে গেল। আমার দুর্ভাগ্য অন্তরালে নির্ধারিত হতে চলল। আমার দিকে চেয়ে সবাই ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা বলতে লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক পর আমার ডাক পড়ল। দুরুদুরু বুকে, থরথর পায়ে এক-পা এক-পা ক'রে যেতে লাগলাম। পথে ছাত্ররা সব করুণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। হেডমাষ্টারের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে পা আমার ভেংগে পড়ল, আমি বসে পড়লাম। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে কোথা থেকে প্রবোধদা এসে আমাকে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে ব'সে ছিলেন হেডমাষ্টারবাবু, জজ চন্দ্রবাবু, অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, আর একজন ইংরেজ সাহেব। 'হেলো' ব'লে সাহেবটি উঠে এসে আমার হাত ধরলেন। আমি চমকে উঠলাম। চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাকে বললেন, ইনি আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার পেডি, এইমাত্র এসেছেন তোমার সংগে কথা বলতে। মিষ্টার পেডিকে আমি চিনলাম, কারণ দু'দুবার আমার বিচার হয়েছিল তাঁর কোর্টে। কিন্তু তিনি কেন আসবেন আমার সংগে কথা বলতে তা ভেবে পেলাম না।

মিষ্টার পেডি পরিষ্কার বাংলায় আমাকে বললেন, চিনতে পেরেছ আমাকে?

পেরেছি সার্।

তোমার পরীক্ষার নম্বর দেখে খুব খুশী হয়েছি।

হেডমাষ্টার বললেন, এরকম নম্বর এ স্কুলে আর কেউ কোনোদিন পায়নি সার্।

পেডি আমাকে বললেন, তুমি এখনও শোননি যে লীগ অব নেশন্স্-এর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তুমিই ফাষ্ট হয়েছ?

স্বপ্ন দেখছি মনে হ'ল। মুখ থেকে আমার কোনো কথা বেরোল না। মিষ্টার পেডি নিজে ব'সে আমাকেও তাঁর পাশের চেয়ারটাতে বসিয়ে বললেন, আমি কিন্তু এসেছি তোমাকে অন্য কথা বলতে। মন্দির-প্রবেশের সত্যাগ্রহে তোমাদের জয় হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট তোমাদের দাবী স্বীকার করেছেন এ জয়ের সব কৃতিত্ব তোমার।

এ কথা ঠিক নয় সার্।

কেন, এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট বলে সত্যাগ্রহ থেমেই গিয়েছিল, তোমার সাহসের জন্যই আবার সেটা শুরু হয়েছিল।

শুধু কংগ্রেসের মান রাখার জন্যই আমি সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলাম, আমার মনের মধ্যে কোনো আগ্রহ ছিল না।

এতবড় একটা সমাজ-সংস্কারের মধ্যে আগ্রহ ছিল না কেন?

ধর্মের ব্যাপারে কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করুক এটা আমি চাইনি।

পুরোহিতদের অন্যায়টা কি তুমি স্বীকার কর না?

অন্যায় হলেও, তাদের নিজেদের জায়গায় অন্যকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অধিকার তাদের আছে

যাদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না তারাও তো চায় পূজো করতে।

তারা নিজেদের জায়গায় একটা মন্দির ক'রে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন পুরোত ঠিক ক'রে নিক।

অব্রাহ্মণ পূজো করবে?

ভগবানের কাছে আবার ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ কি?

আমাকে তাড়াবার প্রস্তাব কোথায় তলিয়ে গেল। আমি ক্লাশে ফিরে এসে বসলাম। সমস্ত স্কুলে আমার গল্প ছড়িয়ে গেল। সবাই অস্থির হয়ে উঠল আমাকে নতুন ক'রে দেখতে, আমার সংগে কথা বলতে। চন্দ্রবাবুর ছেলে অরুণ ছিল এতকালের ফার্ষ্ট বয়। আমি আসার পর থেকে আর সে ফার্ষ্ট হতে পারত না, এজন্য সে আমাকে মোটেই দেখতে পারত না। আজ সেও সমস্ত ক্রোধ বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে আমাকে সানন্দ অভিনন্দন জানাল। মিষ্টার পেডির অভ্যর্থনায় রাত্রে যে তাদের বাড়ী ভোজ হবে তাতে আমাকে আর সর্বঘৃণ্য গৌরকে নিমন্ত্রণ করল। অনেকদিন পর আবার গৌর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার স্পর্শে আজ আমার শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠল।

আমার সম্মানার্থে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে পর হেডমাষ্টারবাবু আমাকে নিরালায় ডেকে নিয়ে বললেন, এখন বুঝলুম কেন তুই ভক্তিযোগ বইটা পড়িস্ নি। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, আরেকবার পড়তে চেষ্টা করব, সার্?

না, দরকার হবে না, যাদের ভাল করার উদ্দেশ্যে এ-বই লেখা হয়েছে তুই তাদের দলের না।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না তাঁর কথা। একবার মনে হ'ল আমাকে তিনি খুব খারাপ ছেলে মনে ক'রে নিরাশ হলেন। আবার মনে হ'ল এই স্নেহশীল আপাত-রুক্ষ শিক্ষকটি আমার ওপর অভিমান করলেন। তিনি বললেন, আমার নিজের ছেলেপিলে নেই, তোরাই আমার সব। আর কয়দিন পরে তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি, আবার কবে দেখা হবে তার ঠিক নেই। আমার একটা কথা রাখবি, সমীর ?

আবার ব্রহ্মচর্য ক্লাসে যাব সার্ ?

না, তারও দরকার হবে না তোর, তুই শুধু কোঁচা দিয়ে কাপড় প'রে মাথায় সিঁথি কেটে স্কুলে আসবি, তোর ছন্নছাড়া ভাবটা দেখলে বড় কষ্ট হয় আমার।

হেডমাষ্টারবাবু অবিরাম নালিশ করেন আজকালকার ছেলেদের কোঁচা আর সিঁথার বিরুদ্ধে। তাই বড় বিস্মিত হ'লাম।

বাড়ী ফিরে দেখলাম দাদু যেন আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন আমার ঘরের দরজায়। আমাকে দেখে আমার হাতে তাঁর পরমপ্রিয় লাইব্রেরীটির চাবিগুলি দিয়ে বললেন, আজ থেকে আমার লাইব্রেরী তোমাকে দিলাম, যোগ্য লোক পাইনি ব'লে এতদিন দিইনি কাউকে। আবার বিস্মিত হলাম। মেজমামীমার ছোট মেয়ে মিনু রোদে খেলে খেলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, দাদু তাকে দেখে রাগ ক'রে বললেন,

লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে রোদে ঘুরে ঘুরে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে, যা, ঘরে যা বলছি। অমনি মিনুও রাগ করেই বলে উঠল, কালো হওয়াই তো ভাল, আমি সমীরদার মতো কালো হব, তাঁর মতো লেখাপড়া শিখব। রূপসী গর্বিতা নাতনিটির মুখে এমন কথা শুনে দাদু খুশী হয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনলেন। মামাবাড়ীতে কাউকে গালি দেবার সময় শুধু আমার সংগে তার তুলনা করা হ'ত। আজ এসব দেখে শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অনেকরাত্রে অরুণদের বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে আবার নতুন ক'রে জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম মাসীমা বসে আছেন আমার ঘরে। আমাকে দেখে গুণ গুণ ক'রে গাইলেন— যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে তুই একলা চল্ রে। বললেন, সমীর, তুমি অদ্ভুত, একার জোরে সকল বাধা জয় ক'রে ঘরে বাইরে সবার কাছে নিজের স্থানটি করে নিলে। আমি বললাম, কেন, কি করেছি ?

অরুণের মতো দাম্ভিক ছেলের মাথা নুইয়েছ, দাদুর মুখে হাসি ফুটিয়েছ, মিনুকে দিয়ে কালোর জয়গান করিয়েছ, বারীনের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করেছ, আর করার বাকী রইল কি ?

বারীন কি বলেছে ?

বলেছে সমীরদার মতো বড় মানুষ এ পৃথিবীতে আর হয় না।

এমনসময় জানালা দিয়ে দেখা গেল বড়মামীমা, প্রভাদি ও মিষ্টার সান্ন্যাল পুকুরপাড় থেকে বেড়িয়ে ফিরলেন।

বড়মামীমা বললেন, গ্রামের স্কুলে ফার্ষ্ট সবাই হতে পারে। সান্যাল বললেন, লীগ অফ নেশান্‌স্‌টা একেবারে বোগাস্‌, ওদের 'এসে' কম্পিটীশনের কোনো মানেই হয় না। প্রভাদি বললেন, যাই বল তোমরা, সমীরের সাহস বিদ্যা দুইই আছে, নইলে মিষ্টার পেডির মতো ইংরেজ আসত না ওকে কংগ্রেচুলেট করতে। ইংরেজরা বাজে কাজ করে না।

পরদিন থেকে ঘৃণায় আমি গৌরের সংগে পিছনের বেঞ্চে বসলাম না। ভয় হতে লাগল আবার যদি সে তার কাছে বসতে ডাকে। কিন্তু কয়দিন পরে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম যে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

এগার

মিষ্টার সান্যাল বারীনকে পড়াতে ছুটি নিয়ে এ বাড়ীতে ছিলেন। চেষ্টা করছিলেন মাসীমাকে পড়ানোর দায়িত্বটাও নিজের ঘাড়ে নিতে। কিন্তু তাঁরা দুজনের একজনও সান্যালের কাছসুদ্ধ গেল না। ফলে প্রভাদি আমার ওপর খুশী হলেও, সান্যাল আর বড়মামীমা তেলে বেগুনে চটে গেলেন।

কিন্তু ম্যাট্রিকের টেষ্ট-পরীক্ষায় আমি সারা জেলার সকল স্কুলগুলির মধ্যে প্রথম হওয়ায় শিক্ষক ছাত্র সকলেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আবার গ্রামের সকলে বলাবলি

করতে লাগল এবার ইউনিভার্সিটিতে আমিই ফার্ষ্ট হব। তাই তাঁদের রাগে আমার কিছু ক্ষতি হ'ল না। মাসীমাও শহরের একটা স্কুল থেকে টেষ্ট দিয়ে ভালভাবে পাশ করালেন। বারীনের মতো খারাপ ছেলেও এবার সেকেণ্ড হ'ল তাদের ক্লাশে। শুনে সান্নাল বললেন তাঁর কাছে পড়লে বারীন ফার্ষ্ট না হয়ে পারত না। বড়মামীমা আমাকে সারাক্ষণ গালাগালি করতে লাগলেন।

একদিন বিপ্লবী সাম্যবাদী সমিতির কাছ থেকে আমার ওপর একটা অনুরোধ এল খুব জরুরী একটা কাজ ক'রে দিতে। একজন মেল-ডাকাতির আসামীকে পুলিশ নিয়ে যাবে, তাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। কি-যে তাদের বলব ভেবে না পেয়ে রাত্রে পড়ার সময় মাসীমাকে জিগগেস করলাম, কি করব?

বলে দাও তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

বিপজ্জনক কাজ এড়াবার মধ্যে একটা কাপুরুষতা আছে না?

তুমি যে কাপুরুষ নও, শুধুমাত্র নীতির জন্যই তাঁদের সংগে কাজ করতে চাও না তাঁরা এটা খুব ভালভাবেই জানেন।

নীতির জন্যও কাপুরুষতাকে একবার প্রশ্রয় দিলে কাপুরুষরা তখন নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য মিথ্যে নীতি খুঁজে বেড়ায়।

আগে লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে নাও। তোমার মেজমামা তোমাকে বিলাত পাঠাবেন, সেখান থেকে পড়া শেষ ক'রে ফিরে আসতে আসতে আমার জায়গা জমিও আমার হাতে এসে যাবে। সেখানে একটা আদর্শ কৃষিপ্রতিষ্ঠান আর একটা আদর্শ বিদ্যালয় তৈরি করবে।

মাসীমার কথায় একটা নতুন আশার সঞ্চার হ'ল আমার মনে। আমি বললাম, তুমি থাকবে না আমার সংগে? সুমধুর স্মিতহাস্যে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে তিনি বললেন, থাকব।

বিপ্লবী-দলকে কি বলব তাহলে?

বলে দাও যাবে না।

এবারের মতো আসি গে।

যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে একটা বাজে কাজের জন্য আমাদের সব আদর্শ পণ্ড হয়ে যাবে, কত ক্ষতি হয়ে যাবে দেশের।

আমি বলে দিই ধরা পড়লে আমি কোর্টে মিথ্যেকথা বলতে পারব না, যদি তারা রাজী হয় তবে যাব।

বড় জেদী মানুষ তুমি, দেশের ক্ষতিটার কথা ভাবচ না।

অনেকরাত্রে মাসীমা আমার ঘর থেকে গেলেন। শেষরাত্রে আমার ঘুম ভাংগল না। ভোরে জেগে উঠলাম মাসীমার গানে। স্নানাদি সমাপন ক'রে তিনি ফুলের সাজি হাতে বাগানে চলেছেন গাইতে গাইতে: 'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসারকাজে, তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তরমাঝে।' বেরিয়ে দেখলাম তিনি ঘুরে ঘুরে ফুল তুলছেন আর গাইছেন: 'সব কলরবে সারাদিনমান শুনি অনাদি সংগীতগান।' নবীন ঊষার শান্ত রংগীন পরিবেশে সে মন্ত্রগুঞ্জনে বিমোহিত হয়ে আমার অন্তরাত্মা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে বারেবারে বলতে লাগল: 'তুমি বামকরে লয়ে সাজি কত তুলিছ পুষ্পরাজি, দূরে দেবালয়তলে ঊষার রাগিনী বাঁশীতে

উঠিছে, বাজি, এই নির্মলবায় শান্ত ঊষায় জাহ্নবী-তীরে আজি।'
আমি মাসীমার কাছে গিয়ে জিগগেস করলাম, এত ফুল তুলছ যে আজ? তিনি আগ্রহভরে বললেন, আজ যে বারীনের জন্মদিন! আশ্চর্য, আমাকে ভালবাসে ব'লে বারীন মাসীমার এত প্রিয় হয়ে উঠেছে আজকাল।

কোথা থেকে ছুটে এসে বারীন মাসীমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল। মাসীমা তার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বড়মানুষ হও। বারীন আমাকে প্রণাম করে বলল, আমি সমীরদার মতো হব। মাসীমা বললেন, তাই হয়ো।

আমি তার আশ্রফালি নাওয়া খাওয়ার অবসর পর্যন্ত পেলাম না। বেলা বারটা বেজে গেল তবু সবকিছু ভুলে গিয়ে উৎসবের আয়োজনে মেতে রইলাম। আমি একা একা চুপিচুপি একটা ঝোপের মধ্যে ব'সে ফুলের তোড়া বানাচ্ছিলাম, মাসীমা এসে আমার হাতে ছুটো লেফাফার চিঠি দিয়ে বললেন, সান্ন্যালটার জন্য আর পারা গেল না।

কি হ'ল আবার?

লোকটাকে দেখলেই আমার বিশ্রী লাগে, মিছিমিছি আমার কাছে ব'সে থাকবে আর চাটুকারি করবে।

কাজের দিনে একটু দেখাশুনা করবে না?

আমাকে বলে সমীর বড় হয়েছে, এখন তার সংগে তোমার মেশামেশি করা উচিত নয়।

ঠিক কথাই তো বলে, এখন তোমার চেয়ে আমি বড়।

বাজে কথা বলো না।

যাও মাসীমা, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর, বড্ড খিদে পেয়েছে।

মাসীমা চলে গেলে আমি চিঠি দুখানা দেখলাম। একখানা মায়ের চিঠি, সামন্তপুর থেকে লিখেছেন। আরেকখানা মেজমামার চিঠি, রেংগুন থেকে লিখেছেন। মায়েরটা পকেটে রেখে দিয়ে মেজমামারটা খুললাম। মেজমামা বিশেষ চিঠিপত্র লিখেন না। তাঁর চিঠি পাওয়াটা বাড়ীর সকলের পক্ষেই একটা কল্পনাতীত সৌভাগ্য। হয়তো তিনি আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফীস্‌এর টাকার কথা অথবা কলেজে পড়ার কথা কিছু লিখেছেন। মেজমামার স্নেহশীল প্রশান্ত মূর্তিখানা আমার মনে ভেসে উঠল। উল্লাস ও আগ্রহের সংগে চিঠিখানা পড়তে লাগলাম ঃ সমীর, আমার একটা অগাধ আস্থা ছিল তোমার নৈতিক চরিত্রের ওপর। তোমার বড়মামীমার চিঠিতে জানলাম তুমি দুশ্চরিত্র হয়ে গিয়েছ। চাঁপার সম্ভ্রম নাকি বিপন্ন করতে চেষ্টা করেছ। এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি আমাদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে চিরদিনের মতো বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেয়ো।

আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, শরীরটা অবশ হয়ে এল, মনটা নিশ্চল হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম। দূর থেকে বাড়ীর লোকেদের মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল ব্যাপারটা অজ্ঞাত নয় তাদের কাছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আশা ছেড়ে দিলাম। কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ভয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে হেঁটে চললাম মাঠের দিকে।

বড়মামীমার সংগে দেখা হল। কেমন ভীতকণ্ঠে বললেন, সমীর, আজ আমার বারীনের জন্মদিন, কোনো শাপ-মন্যি করিস্ নে, বাবা। তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে বললাম, আমার ভাইকে আমি শাপ দেব কেন, বড়মামীমা? ব'লেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় রওনা হলাম আমার একমাত্র আশ্রয় মায়ের কাছে। রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মায়ের চিঠিখানা খুললাম। লিখেছেন: সমীর, তোমার মতো ছেলের মুখ দেখাও পাপ। স্বাধীনতা সংগ্রাম কলংকিত হয় তোমার মতো দুশ্চরিত্র ছেলের সংস্পর্শে। তোমার বড়মামীমার পত্রে সব জেনে ভাবছি তোমার মতো ছেলে মরে যাওয়া ভাল। আজ থেকে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই তোমার সংগে।

থমকে দাঁড়ালাম। আত্মীয় পরিচিত কারও কাছে আমার এ মুখ আর দেখানো চলবে না। সহায়হীন সম্বলহীন উদ্দেশ্যহীন আশাহীন জীবনযুদ্ধের একটা ঘন-কালো ছবি এসে আমার মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। কোথায় যাব?

বার

গ্রামে গ্রামে অনেকদিন ঘুরে তারপর দু'একটা ছোট শহরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও থাকার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল. আঠার বছর

বয়সেও আমার পাশ করা হ'ল না। নিরাশ হয়ে আমি কলকাতার দিকে হাঁটতে লাগলাম। স্বপ্নলোকের কল্পতরু কলকাতাতে পৌঁছতে পারলেই সব দুঃখ ঘুচে যাবে ভেবে অনিদ্রায় অনাহারে মাঠঘাট খালবিল বনজংগল পেরিয়ে সেদিকে হাঁটতে লাগলাম।

পথে পথে অনেকদিন কেটে গেল।

একদিন গভীর রাত্রে পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে একটা মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। পুরোহিত দয়া ক'রে একটু প্রসাদ ও শোবার জায়গা দিলেন। তবে অসময়ে তাঁকে আমার কাছে ব'সে বন্দুকটা পরিষ্কার করতে দেখে বুঝলাম যে তিনি আমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন—যদি চোর ডাকাত হও তো বিপদ আছে। তাঁকে এই অমূলক ভয় থেকে নিশ্চিন্ত করতে আমি বললাম, এটা কি, ঠাকুরমশাই? অমনি তাঁর মুখ থেকে, ভয়ের চিহ্নটুকু মুছে গেল, তিনি হেসে বললেন, বোকা ছেলে, এতবড় হয়েছ, বন্দুক দেখনি এখনও!

একটা তীব্র শব্দে ঘুম ভেংগে গেল। চতুর্দিকের জংগলাকীর্ণ সূচীভেদ্য অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ ক'রে একটা চিতাগ্নি জ্বলছে। শ্মশানবন্ধুরা ভয়ংকর ধ্বনি করছে—বল হরি, হরিবোল। নিকটে আরেকটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। বিরাট বিকট এক কাপালিক সন্ন্যাসী তার পাশে ব'সে আছে। শবদাহকারীরা কাজ শেষ ক'রে চলে গেল। পুরোহিত ঘুমুচ্ছেন তাঁর বাসায়। নির্জন অরণ্যে আসন্ন অপমৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না। হঠাৎ ধ্যানাসীন

সন্ন্যাসী তাঁর জটাবৃত বীভৎস মাথাটা ঘুরিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠলেন, হাঃ হাঃ হাঃ। বনটা কেঁপে উঠল। ঘুমন্ত পাখীরা ভয়ে ঝট্‌পট্ ক'রে উঠল।

আতংকে কেঁপে উঠে সেদিকে চাইতেই আমার মনে হ'ল সন্ন্যাসীকে আমি চিনি। তিনি কাপালিক নন, বিখ্যাত তান্ত্রিক জ্যোতিষী গোপীনাথ আচার্য। দেশভ্রমণে বেরিয়ে হয়তো ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে বললাম, আচার্যমশাই এখানে? সানন্দ বিস্ময়ে তিনি বললেন, তুমি বাবা এমনসময় এখানে কেন?

হাঁটা-পথে কলকাতা চলেছি।

আঘাত অনেক আসবে জীবনে, তাই ব'লে সংকল্পের পথ ছেড়ে দিয়ো না নিরাশ হয়ে। আঘাত ক্ষতিও করতে পারে, উন্নতির পথে সহায়তাও করতে পারে। তোমার মনস্কামনা একদিন পূর্ণ হবেই।

আমার কোনো মনস্কামনা নেই, আচার্যমশাই।

তুমি বিদ্বান হবে, দেশকে স্বাধীন করবে, সন্ন্যাসী হবে।

সন্ন্যাসী হব আমি! মরণও ভাল তার চেয়ে।

কৌপীন পরে জংগলে থাকলেই কি শুধু সন্ন্যাসী হয়, ভোগের মধ্যে থেকে যে উদাসীনভাবে সমাজসেবা করে যেতে পারে সেই হচ্ছে প্রকৃত সন্ন্যাসী। কিন্তু শোন, বাবা, সন্ন্যাসীই হও আর যাই হও, বামাজাতিকে উপেক্ষা করো না কখনও। শক্তিকে বাদ দিয়ে বিজয়ী হওয়া যায় না সংসারে।

বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, আচার্যমশাই আমার মনের এত কথা জানলেন কিক'রে? তিনি আবার বললেন, একথাটা কখনও ভুলো না আমাদের অধঃপতনের মূলে আছে আমাদের সমাজবোধের অভাব, আর পরনির্ভরতার স্বভাব। এ দোষগুলি দূর করতে হবে।

কিক'রে করব আচার্যমশাই?

নিজের চরিত্রবলে নিজেকে উদাহরণ দেখিয়ে।

হিন্দু মুসলমানে মিলন হবে কিক'রে?

বিভেদ আসে নিশ্চলতা থেকে। যেদিন হিন্দুরা নিশ্চল হয়ে প'ড়েছে সেদিনই এসেছে তাদের মধ্যে অসংখ্য জাতিভেদ। আবার ভারতবর্ষ সচল হলেই ভুলে যাবে এসব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান; খৃষ্টান, পারসিক, বৌদ্ধ সব হয়ে যাবে এক। সবার ওপরে মানুষ হবে সত্য।

সন্ন্যাসী চলে গেলে আমিও পুরোহিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম নিজের পথে। অনাহারে অনিদ্রায় আরও দুদিন কাটিয়ে বহু লোককে জিগগেস করতে করতে পৌঁছলাম এসে রাজধানীর সীমান্তে। জীবনে প্রথম রাজধানী দেখলাম। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান রাজধানীর লোকেরা, কত জাঁকজমক নিয়মকানুন সভ্যতা-ভব্যতা আছে তাদের মধ্যে। আমার দেহে মনে পুলকের শিহরণ জাগল। কত বড় বড় দোকান আছে এখানে। কোথাও গিয়ে চাওয়ামাত্র আমার একটা চাকরি হয়ে যাবে। কলের জলে স্নান ক'রে হোটেলে

খাব। রাত হলেই মাথার ওপর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে উঠবে। হাইকোর্ট, ইউনিভারসিটি, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, হাওড়ার পুল আরও কত কি দেখব।

কিন্তু দোকানে গিয়ে মুখ থেকে কথা বেরোয় না। নিজের দুঃখের কথা কিছুতেই অন্যের কাছে মুখ ফুটে বলতে পারি নে। অনেক চেষ্টার পর একটা দোকানে চাকরি চাইলে তারা সংগে সংগেই বলে দিল, হবে না। খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে খাবারগুলির দিকে চেয়ে থাকি, নিজের অজ্ঞাতে আমার চলার গতিটা থেমে যায়। বড় ভাল লাগে চেয়ে থাকতে। খিদে আমার বেড়ে যায়, পেটটা ব্যথিয়ে ওঠে, তবু ভাল লাগে সেগুলি দেখতে। আরও অনেক ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ে আমার মতো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খাবারের দিকে চেয়ে আছে। খাবারটা আছে, মানুষ কাজ ক'রে খেতে চায়, তবু খেতে পায় না। অন্য দেশে মানুষ না খেয়ে মরে অজন্মার সময়, এদেশে মরে সবসময়। একবার সাম্যবাদ এলে পর আর এসব থাকবে না।

শ্যামবাজার থেকে হেঁটে হেঁটে কালিঘাট চলে এলাম, চাকরি পেলাম না কোথাও। বিনে পয়সায় খেতে পাওয়া যায় শুনে কালিঘাট মন্দিরে গেলাম। কিন্তু রাত্রি অনেক হয়ে গেছে, কাংগালি-ভোজনও শেষ হয়ে গেছে। নিরাশ হয়ে আবার ফিরে চললাম। হরিশ মুখার্জি রোডে একটা বড় বাড়ীর সমুখে চাকর এসে অনেক ভাত তরকারি ফেলে দিয়ে গেল। লোকজন কেউ ছিল না আশেপাশে, তবু একবার এদিক ওদিক তাকালাম।

তারপর সাগ্রহে গেলাম সেগুলির কাছে। দেখলাম একটা কুকুর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বসে আছে সেগুলি খাবার জন্য। আমাকে দেখে সরে গেল। আমিও থমকে গেলাম। মন আমার চলে গেল সুদূর অতীতে, আমার বাবা মরে গেলে আমার মাও এমনি অভুক্ত অবস্থায় বসে থাকতেন আমাদের নিয়ে। আমি না খেয়ে চলে এলাম। সাম্যবাদ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। আমাদের শাস্ত্রও যে সমর্থন করে সাম্যবাদকে। বেদান্ত দর্শনের মতে সকল মানুষই মূলতঃ সমান। একজন না খেয়ে থাকবে, আরেকজন খাবারটা নষ্ট করবে, এ ব্যবস্থা কোনো সমাজই পারে না সহ্য করতে।

তের

যার মনের মধ্যে ভিক্ষার প্রবৃত্তি আছে সে অবলীলাক্রমে একজনের কাছে একটা জিনিস চাইতে পারে। যার নেই সে কিছুতেই চাইতে পারে না। শত অভাবে পড়লেও না, মরণের মুখে দাঁড়িয়েও না। এর মধ্যে ধনী দরিদ্র নেই। একজন ধনীও কত সহজে পরের জিনিস গ্রহণ করতে পারে, আবার একজন দরিদ্র কিছুতেই তা করতে পারে না। আমার বেলাতেও তাই হ'ল। কয়দিন অনাহারে থেকে জীবন্মৃত হয়েও কারও কাছে একটি পয়সা ভিক্ষা চাইতে পারলাম না।

একদিন অনেকরাত্রে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ভবানীপুরে বাজারের কাছে এসে একটা চালের দোকানের সিঁড়ির ওপর শুয়ে পড়লাম। সংগে সংগেই ঘুম এসে পড়ল।

কার কঠিন করস্পর্শে ঘুম ভেংগে গেল। চমকে চেয়ে দেখলাম দানবের মতো একটা লোক আমার মাথা ধ'রে নাড়ছে। কৃষ্ণবর্ণ সে ভীষণ লোকটাকে দেখে আমার ভয় হলো এখানে শুয়ে কোনো অন্যায় ক'রে ফেলেছি। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলাম। কর্কশস্বরে সে বলল, ওকি রে পাগলের পারা কাঁদছিলি কার তরে ?

ভয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আর করব না।

কর্কশ একটা হাসি হাসতে হাসতে সে বলল, কি করবি নে ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিসব বকচিস্ রে তুই ?

আমি নীচে রাস্তায় নেমে শুই ?

না, আমার সাথে ঘরকে চল্, নইলে আবার ভয় পাবি।

কোথায় যেন তার গলাটা শুনেছি বলে মনে হ'ল। ভয় হ'ল যদি মেরে ফেলে আমাকে কোথাও নিয়ে। তবু যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে লাগলাম তার সংগে। সে আমাকে জিগগেস করল, বাবা বাবা ব'লে ডাকছিলি ক্যানে রে, তোর বাবা কি থাকে এখানে ?

এবার তার সস্নেহ প্রশ্ন শুনে আমার মন থেকে ভয় চলে গেল। একটা অপরিচ্ছন্ন বস্তির এক জীর্ণ কুটিরে আমরা দুজনে প্রবেশ করলাম। মেজের ওপর ঘুমিয়েছিল একটি মেয়েমানুষ।

তারই পাশে একটা ছেঁড়া বালিশ ফেলে দিয়ে সে আমাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়্। নিজেও শুয়ে পড়ল সেখানে।

পরদিন ঘুম ভাংগলে দেখলাম অনেক বেলা হয়ে গেছে, বাইরে অনেক লোকজন কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। বেশ একটু সময় লাগল কোথায় আছি সেটা ঠিক করতে। তারপর ভাবলাম, কি করব ? বসে থাকব, না চলে যাব ? এমনসময় চা খাবার নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল বাসন্তী। হাসতে হাসতে আমাকে বলল, বেশ তুমি দাদা, রাত্তিরে জাগালে না কেন আমাকে ? এখানে তাকে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম, আমি জানব কিক'রে তুমি এখানে আছ ?

তোমরা সব পুরুষ মানুষ সমান। শম্ভু বলল 'আমি চিনব কিক'রে সমীরদাকে', তুমি বল 'আমি জানব কিক'রে বাসন্তীকে'। আমি তো একবার দেখেই চিনে ফেলেছি তোমাকে।

বাসন্তীর মুখে শম্ভুর নাম শুনে আমার মেজাজটা বিগড়ে গেল। জিগগেস করলাম, শম্ভু-চোরার কথা বলছ ?

হাঁ।

চোরটার সংগে থাক তুমি ?

কোনোদিন দেখিনি তো তাকে কোনো অন্যায় করতে।

আমি মুখ ধুয়ে এসে আবার বিছানায় বসলাম। খুব খিদে পেয়েছিল, তবু কিরকম লাগছিল বাসন্তীর হাতের খাবারটা ধরতে। কিক'রে সেকথা বুঝতে পেরে বাসন্তী বলল, খেতে ঘেন্না করলে হোটেলে গিয়ে খেয়ে এস, বিকালে শম্ভু এলে একটা

মেস্-এ গিয়ে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। সে আঁচল থেকে একটা টাকা আমার সমুখে রেখে বলল, কিন্তু মেস্-এ হোটেলে যাদের রান্না তোমরা খাও তারা তো ভাল নয় আমাদের চেয়ে ?

আমি খেতে খেতে বললাম, পিসীমা কোথায় ?

মা মারা গেছেন কয়েক মাস আগে। তোমার কথা খুব বলতেন। মরার সময়ও আমাকে বলেছিলেন, সমীরের সংগে দেখা হ'লে তোর আর কোনো দুঃখ দুশ্চিন্তা থাকবে না।

এরকম অশিক্ষিত দুশ্চরিত্রদের মধ্যে থাক কিক'রে তুমি ?

উপায় নেই যখন, থাকতেই হবে।

লেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছ ?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে নই ব'লে কেউ আমাকে সার্টিফিকেট দিলে না, পরীক্ষাও দেওয়া হ'ল না। তারপর এ-কয়মাস আর লেখাপড়া করিনি। একটা বাসায় বাসন মাজার ঠিকা কাজ নিয়েছি। সকালবেলা কাজে যাই, দুপুরবেলা কাজ শেষ ক'রে ফিরে এসে রান্না করি। শম্ভু খুব সকালে রিক্সা নিয়ে চলে যায়, বিকালে এসে ভাত খায়।

বাসন্তী কাজে চলে গেল।

ফিরে এসে সে আমাকে স্নানের ঘরে নিয়ে পাঁচ বছরের ছেলের মতো গা মেজে নাইয়ে দিল। নতুন জামা কাপড় দিয়ে বলল, পরো।

আমি বললাম, কোথায় পেলে এসব ?

শম্ভু কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি নতুন জামা কাপড় পরে খাওয়া দাওয়া ক'রে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বড় বড় দোকান, পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা মানুষ, গাড়ী ঘোড়া, আরও কতসব দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগলাম। খিদের মধ্যে কাল এত ভাল লাগেনি শহরটা, আজ একটা আশ্রয় পেয়ে সবকিছুই সুন্দর লাগল। শহরবাসীদের শিক্ষা সভ্যতার কথা ভেবে মনে হ'ল তাদের সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই।

হঠাৎ একটা অদ্‌ভুত কাণ্ড ঘটল। একজন ফর্সা কাপড় পরা ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন একটা দোকানের কাছ দিয়ে, ভিতর থেকে দোকানদার তাঁর গায়ে পানের পিচ ফেললেন। ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে দোকানদারও ক্রুদ্ধ হয়ে ব'লে উঠল, আপনি কোন্‌ বিলাত থেকে এসেছেন মশাই, গোলমাল না ক'রে সরে পড়ুন। দোকানদারদের সংখ্যা বেশী দেখে ভদ্রলোক বাধ্য হলেন সরে পড়তে। আমার বড় কষ্ট হ'ল তাঁর পরিষ্কার কাপড় জামার এই দুর্দশা দেখে। আরও কষ্ট হ'ল দোকানদারটির মতো একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে এমন অবিবেচনা ও স্বার্থপরতা দেখে। ভিতর থেকে না দেখে রাস্তায় পিচ ফেললে যে মানুষের গায়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে সেকথা কি তিনি বোঝেন না? অথচ নিজের দোষের জন্য লজ্জিত না হয়ে তিনি রুষ্ট হলেন ক্ষতিগ্রস্ত পথচারীটির ওপর। মনে পড়ল আমার বড়দার কথা। তিনি বলতেন অধঃপতিত বাংগালী চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য, তারা যেমন ভুলেছে কৃতজ্ঞতা দেখাতে তেমন ভুলেছে দোষ স্বীকার করতে।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলেও সে-ভাবটা আমার বেশীক্ষণ রইল না। আরও অনেক ভদ্রলোককেই দেখলাম ওরকম করতে। একটা খুব বড় সবুজ মাঠের ধারে বসার বেঞ্চি দেখে আমি গিয়ে তাতে বসলাম। রেল লাইনের ওপর দিয়ে শো শো ক'রে চলেছে যেন ছোট ছোট লঞ্চ, তার মাথার ওপর আবার রয়েছে টেলিগ্রাফের তার। দারোগার মতো পোষাক পরা লোকেরা সেগুলি চালাচ্ছে। বড় ঘরের মতো মটরগাড়ী চলেছে, তাদের কারও বা নাম মেনকা, কারও নাম কিন্নরী, আবার কারও বা নাম চিত্রলেখা। বড় ভাল লাগল সে নামগুলি পড়তে। তাদের কপালে লেখা—শ্যামবাজার 2A, বুঝলাম শ্যামবাজারের ভাড়া দুই আনা। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল লাইনের ওপর থেকে কোনো একটা লঞ্চ হয়তো ছুটে এসে আমার গায়ে পড়বে, সভয়ে আমি সরে গিয়ে দূরে বসলাম।

সন্ধ্যার সময় ফেরার পথে একটা বাড়ীর দরজায় দেখলাম লেখা আছে—ফ্রী রীডিং রুম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম নানা লোকে নানা বই পত্রিকা পড়ছে, আরও অনেক বই সাজানো রয়েছে আলমারির মধ্যে। মনের খুশিতে অনেকদিন পরে আবার বই পড়লাম।

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে একটা বাড়ীর সমুখ দিয়ে যেতে আমার জামাটার ওপর এসে পড়ল একটা জ্বলন্ত বিড়ির টুকরো। নতুন জামাটা একটু পুড়ে গেল। শম্ভুরা দেখলে কি ভাববে, আমিই বা আর জামা পাব কোথায় ভেবে কান্না পেল আমার।

ভিতর থেকে যে-লোকটি বিড়িটা ফেলেছিলেন তিনি বলে উঠলেন, ছোঁড়া, চোখে দেখতে পাস্ নে। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চিনতে পারলাম ইনি হচ্ছেন সে-লোক যাঁর গায়ে তখন পানের পিচ পড়েছিল দোকান থেকে। আমি নিঃশব্দে চলে এলাম সেখান থেকে। বাসায় ফিরে দেখি বাসন্তী উদ্‌বিগ্ন মুখে দোরগোড়ায় বসে আছে আমার প্রতীক্ষায়।

ঘরের মধ্যে এসেতো আমার চক্ষু স্থির, এ-যে স্কুলের বদছেলে গৌর! রিক্সাওয়ালাদের সংগে সারাদিন থেকে থেকে হালচাল কথাবার্তা সবই তাদের মতো ক'রে ফেলেছে। আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ছুটে এসে সানন্দে জড়িয়ে ধরল। আমি কিছু বলার আগেই বলল, না, না, আগের নাম আর নয়, এখন থেকে শম্ভু বলে ডাকবা। আমি ভাবলাম, কিক'রে সে স্কুলে পড়ার সময় তার মূর্খতা লুকিয়ে রেখেছিল?

চৌদ্দ

শম্ভু বাসন্তীকে না জানিয়ে আমি এক বড়লোকের বাড়ীতে পাঁচটাকা মাইনেতে গাড়ী ধোয়ার চাকরি নিলাম। সকালে বিকালে কাজ, দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি। সে-সময়টাতে আমি আবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। বাড়ীর গৃহিণী নিজে লেখাপড়া জানেন না ব'লে চাকর-বাকরদের লেখাপড়া

পছন্দ করেন না। তাই বাড়ীর পাশেই হরিশপার্কে ব'সে লেখাপড়া করি। কখনও কখনও আবার আমাদের বাসায়ও চলে আসি।

শম্ভূ বাসন্তী আমাকে বলল একটা ভদ্রলোকের মেস্-এ গিয়ে থাকতে, তারাই যেভাবে হোক টাকা দেবে। আমিও বুঝলাম এই অশিক্ষিত কুখ্যাত সংসর্গে থাকলে জীবনে কখনও উন্নতি করতে পারব না। মনে মনে যেতে না চাইলাম তাও নয়। তবু তাদের টাকায় খেয়ে তাদের ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে যেন কেমন লাগল।

একদিন একটা সুযোগ হয়ে উঠল তাদের ছেড়ে যাবার। এক দিন রাত্রে লাইব্রেরীতে খবর পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে একজন পিয়ন নেবে, আমি গেলে কাজটা পাব। মাইনে আট টাকা, তাছাড়া লেখাপড়ার সুযোগ মিলবে প্রচুর। কাল এগারটার সময় যেতে হবে, সুতরাং দেরী না করে আমার কাপড় জামা ধুয়ে দিতে হবে। বাসায় গেলাম কিন্তু বাসন্তীর কাছে সাবান কেনার পয়সা নেই। এদিকে শম্ভূ রোজ বিকালবেলা বাসায় ফিরে, আজ এখনও ফেরেনি। সে কোথায় তার রিক্সা নিয়ে আছে তাও জানিনে। অনেক রাত্রেও সে না ফেরাতে বাসন্তী বড় উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ল, আমিও বৃথা এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর চড়কডাংগার মোড়ে দেখলাম শম্ভু বসে আছে তার রিক্সার মধ্যে। সানন্দে ছুটে গিয়ে আমি তাকে বললাম, বসে আছ যে?

এখন আমার যাবার উপায় নেই।

কেন ?

এক গরীব বামুন শহরে এইছে মেয়ের বিয়ের টাকা নিতে। অনেক কষ্টে টাকার যোগাড় ক'রে পদ্মপুকুর থেকে আমার রিক্সায় এখানে এসে নেবেছে। যাবার সময় ভুল টাকার পোটলাটা ফেলে গেছে। যখন টের পাবে তখনই পাগলের পারা ছুটে আসবে এখানে। এসে আমাকে না দেখলে একেবারেই পাগল হয়ে যাবে।

কখন সে টের পাবে সেজন্য তুমি বসে থাকবে এখানে ?

উপায় কি ?

তুমি চলো, তার গরজ থাকলে খুঁজে বার করবে তোমাকে।

কিক'রে করবে, একে সে গেঁয়ো মানুষ তাতে না চেনে আমার বাসা, না জানে আমার রিক্সার নম্বর। সাদাসিধে বুড়োমানুষ, বাড়ীর কত দুঃখের কথা আমাকে বলেছে। তুমি যাও, আমি পরে যাব।

কত টাকা ?

বারশ'।

শম্ভু আমার হাতে পোট্‌লাটা দিল। আমি পোট্‌লাটা দেখে রেখে দিয়ে ভাবলাম, এ আবার কেমন চোর ? তার কাছ থেকে কয়েকটা পয়সা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। বাসন্তীকে সব কথা বলতে সে নিতান্ত সহজভাবে বলল, টাকা না ফেরত দিয়ে সে কিছুতেই বাসায় ফিরবে না।

একটা সাধারণ রিক্সাওয়ালার পক্ষে এতটা কিক'রে সম্ভব ?

শম্ভূর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই।

বাসন্তী আমাকে খেতে দিল। আমি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সে বসে রইল না খেয়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম শম্ভু হাসতে হাসতে বাসায় ঢুকে বলল, বামুনটা এসে টাকা নিয়ে গেছে। বাসন্তীর বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল একথা শুনে। আমার মনে পড়ল মামাবাড়ীর কথা, বড়মামীমা গর্ব ক'রে বলতেন বড়মামা মাইনের চেয়েও উপরি টাকা বেশী পান।

যথাসময়ে সাদা ধবধবে কাপড় জামা প'রে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বাসন্তী এসে আমার চুল আঁচড়িয়ে, বোতাম কলার ঠিক করে দিয়ে বলল, কাজ সারা হলেই চলে এসো তাড়াতাড়ি। শম্ভু আমাকে একটা টাকা দিয়ে বলল, সমীরদাকে আজ আর ফিরে পাব না। কাগজের মধ্যে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে বলল, তুই কি তুই-এ বাস-এ গিয়ে গোলদীঘির বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে নামতে হবে।

পরিষ্কার জামাকাপড়ের কি গুণ আছে, পরলেই মনটাও যেন হয়ে ওঠে কেমন উৎফুল্ল। মনের উল্লাসে চললাম বড় রাস্তার দিকে। এক দোতলার বারান্দা থেকে আমার গায়ের ওপর কতগুলি ময়লা পড়ল। ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম একটি ভদ্রঘরের বধূ ঘর পরিষ্কার ক'রে আরও ময়লা ফেলতে উদ্যত হয়ে আছেন। কেন জানিনে, আমার একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল

মেয়েদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হয় না। তাই জামাটার অবস্থা দেখে আমার মনটা আরও বেশী খারাপ হয়ে গেল।

2 A বাস্‌এ চ'ড়ে রাস্তার দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রইলাম। এই যে আর্মি নেভি ষ্টোর্স। এই যে হল্ এণ্ড এণ্ডার্সন। এসপ্ল্যানেড। ধর্মতলা ষ্ট্রীট। ওয়েলিংটন স্কোয়ার। এই যে বৌবাজার মোড়। কলেজ ষ্ট্রীট। এই যে বিদ্যাসাগরের পাথরের মূর্তি। দিলাম লাফ ঝুপ ক'রে। কয়েক সেকেণ্ড কোনো জ্ঞান রইল না। হুশ হ'লে দেখলাম হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছে, নতুন কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, শক্ত ছাতাটা ভেংগে গেছে।

শম্ভু আমাকে সবই ব'লে দিয়েছিল, বলেনি শুধু দুটো কথা। নামার আগে কণ্ডাক্টারকে ব'লে গাড়ীটা থামিয়ে নিতে হয়, আর নামার সময় আগে বাঁ পা-টা মাটিতে রাখতে হয়। সেকথা আমিই বা জানব কিক'রে? গাড়ীতে ওঠার সংগে সংগেই ভয়ও হচ্ছিল গাড়ীটা যদি আমাকে নিয়ে চলে যায় কোনোদিকে। তাই সময় হওয়া মাত্রই আর এক মুহূর্তও সবুর সয়নি আমার!

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় গিয়ে অতবড় বাড়ী অতসব লোকজন দেখে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। কাউকে কিছু জিগগেস করতেও ভয় হ'ল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে নানা জায়গায় উঁকি মেরেও কিছু কিনারা ক'রে উঠতে পারলাম না। ভিতরে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে দেখা হ'ল একজন ডাকপিয়নের সংগে। তাকে জিগগেস করতে সে দেখিয়ে দিল একটা ছোট ঘর। আমি গিয়ে সে-ঘরে ঢুকলাম। সেখানে

একটি লোক দাঁড়িয়েছিল তাকে বললাম আমি রেজিষ্ট্রারের কাছে যাব। সর্বনাশ, ঘরটা আমাদের নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল! আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমি লোকটির নির্দেশমতো গেলাম এক দেশী সাহেবের ঘরে। আমার সংগে কথাবার্তা ব'লে তিনি তাঁর সহকর্মীকে ইংরেজীতে বললেন, তুমি কি বুঝলে?

বেশ ভাল মনে হ'ল ছেলেটিকে।

বেশী ভাল ব'লেই আমার আপত্তি।

কেন?

সত্যবাদী আর জোয়ান লোক রাখতে আমি ভয় পাই।

তার মানে?

এটা অভিজ্ঞতার কথা। এসব লোকেরা কাজ করে খুব ভাল, কিন্তু মনিব কোনো অন্যায় করলে সেটা বরদাস্ত করে না। ফলে এদের আর কাজে রাখা চলে না। কারণ মনিবরা এক-আধটুকু অন্যায় জুলুম করেই।

সাহেব জানতেন না যে আমি ইংরেজী কথা বুঝি, তাই আমাকে বললেন, আজ তুমি এসো, পরে তোমাকে জানাব যা হয়। আমি নিরাশমনে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ফেরার পথে আর বাস্এ চড়তে ভরসা পেলাম না। ট্রামে উঠতে আরও ভয় করল। সরল সত্যিকথা বলার বোকামির কথা দুঃখীত মনে ভাবতে ভাবতে হেঁটেই চললাম ভবানীপুরের দিকে। খুব ব্যথা করতে লাগল কাটা হাঁটুটা।

এস্প্ল্যানেডে এসে চোখে পড়ল আমার মনিব ট্রামে চ'ড়ে বাড়ী যাচ্ছেন। ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। চাকরির জীবনে দেরীতে কাজে যাওয়া বা কম কাজ ক'রে ঠিক পয়সা নেওয়া আমি অত্যন্ত অপমানের মনে করি, অথচ আমার মনিব বাড়ী পৌঁছবার আগে আমার সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার। ট্রামে বাস্এ উঠতে ভয় করে, আর কোনো পথও নেই। প্রাণপণে দিলাম ছুট ময়দানের মধ্যে দিয়ে। ট্রাম থামে, আমি থামি নে। হরিশ পার্কে এসে দেখলাম মনিব বাসায় ঢুকলেন। আমি ঢুকলাম পিছনে পিছনে।

মনিব আমার মুখের ক্লান্তভাব দেখে বললেন, কোথায় গেছিলি ? বললাম, বাড়ীতে ছিলাম না, এইমাত্র এলাম। ক্ষেপে গিয়ে তিনি আচমকা একটা চড় মারলেন আমার গালে। একে পা কেটে গেছিল, তারওপর অতটা পথ ট্রামের সংগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে মাথাটা ঘুরছিল, আমি অস্থির হয়ে পড়ে গেলাম চড়টা খেয়ে। পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠে কোনোমতে কাজ সারা করলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আপন মনে বাড়ী ফিরে চলছিলাম, হঠাৎ কাণে এল, সমীরদা, কোথা যাচ্ছ ? শম্ভুর গলা শুনে সানন্দে ফিরে তাকাতে সে আবার বলল, এদিক পানে যাচ্ছ কোথা ?

বাসায় যাচ্ছি।

এদিকে ? পথ হারিইচ ?

আমাকে টেনে রিক্সায় তুলে উল্কাবেগে বাসায় নিয়ে এল। বাসন্তী কাঁদতে ব'সে গেছিল, আমাকে দেখে বলল, পথ

ভুলেছিলে ? সেকথা স্বীকার করতে আমার বড় লজ্জা করল। মনিব যে মেরেছে সেকথা বলতে আরও লজ্জা করল।

কিন্তু বাসন্তীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। প'ড়ে গিয়ে যে কপালটা কেটে গিয়েছিল সেকথার সূত্র ধ'রে সে সব কথা বের করে ফেলল আমার কাছ থেকে। শুনে শম্ভূ তখনই আমার মনিবকে মারতে যায় যায়। কিন্তু বাসন্তী তাকে শান্ত ক'রে রাখল। আমার চাকরিও সেদিন থেকেই বন্ধ করে দিল। আমি প্রাণপণে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পড়তে লাগলাম।

পনের

আমার সংগে সংগে বাসন্তীও লেখাপড়া করতে লাগল। শম্ভূর দৃঢ়বিশ্বাস সে এই রাজরাণীকে কষ্টে রেখে পাপের ভাগী হচ্ছে, তাই তার যশ মানের আশা দেখে বড় আনন্দিত হ'ল। আমি বাসন্তীর পড়াশুনার জন্য খুব যত্ন নিতে লাগলাম।

নিজেদের লেখাপড়ার পর আমি গিয়ে শ্রমিক বস্তিতে লেখাপড়া শেখাতাম। অসুখ বিসুখ দেখলে সেবা-শুশ্রূষাও করতাম। একাজের মধ্যেই একদিন দেখা হল মার্ক্সিষ্ট সাম্যবাদী দলের বিখ্যাত নেতা মিষ্টার সান্ন্যালের সংগে। এবার আমি মুগ্ধ হ'লাম তাঁকে দেখে। শ্রমিক কল্যাণই আজকাল তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। আমার পরিজন-পরিত্যক্ত বুভুক্ষিত হৃদয়ের দুর্বিবহ

শূন্যতাটা অনেকটা যেন ভরে গেল সান্যালদার স্নেহ পেয়ে। মার্ক্সিষ্ট দলের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার ছিল সান্যালদার ওপর। আমিও নিয়মিতভাবে পার্টি-আফিসে গিয়ে তাঁর কাছে পড়তাম।

একদিন এক সভা থেকে কাজকর্ম সেরে বাড়ী ফিরে আমি বাসন্তীকে বললাম, বস্তির জীবন মানায় না তোমাকে। আমাদের নেতার মতো কারও সংগে থাকলে তোমাকে খুব মানাত।

যা হয়নি তা ভেবে লাভ কি, দাদা?

তুমি ইচ্ছে করলেই হয়, তোমাকে সবাই মাথায় তুলে নেয়।

তা নিতে পারে। সুখ সম্ভোগের উদ্দেশ্যে অনেকেই আমাকে পেতে চাইবে, কিন্তু আমাকে যে তারা সুখ দিতে পারবে তা বুঝব কিক'রে?

তুমি কি বলতে চাও শম্ভুর কাছে বস্তিতে যে-সুখে আছ সে-সুখ আমাদের নেতা দিতে পারেন না তোমাকে?

সমীরদা, তুমি বড়ভাই হ'লেও সাংসারিক ব্যাপারে তুমি আমার ছোটভাই। অনেক কিছু জান না, হয়তো জানবেও না। বলতে পার সুখ কাকে বলে?

কেন, পেট ভরে খাবে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরবে, লোকে তোমাকে বড়মানুষ বলবে।

পেট ভরে এখনও খাই, পরিষ্কার জামা কাপড় এখনও পরি। তবে কেউ বড়মানুষ বলে না আমাকে। বড়মানুষের সংগে থাকলে লোকে আমাকে বড়মানুষ বলবে। কিন্তু লোকে বড়মানুষ বললেই কি আমি পারব সুখী হতে?

নিজেকেও হতে হবে বড়মানুষ।

কি ক'রে হতে হবে ?

বড় কাজ ক'রে।

বড় কাজ কাকে বলে ?

নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমাজের সেবা করাকে।

শম্ভু কি তা করে না ?

একথার কোনো জবাব দিতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, শম্ভুর মতো নিঃস্বার্থ সমাজসেবা করতে আমি দেখিনি কাউকে। তবুও তাকে বড়মানুষ ব'লে স্বীকার করতে কেমন লাগল। অথচ এ ছাড়া কাকে বড়মানুষ বলে তাও বুঝলাম না। আমাকে নীরব দেখে বাসন্তী বলল, যারা আড়ম্বর বিলাসিতা করতে পায় না তারা মনে করে তার মধ্যেই আছে যত সুখ, কিন্তু যারা পায় তারা জানে সুখের মূল আছে অন্যখানে।

সবিস্ময়ে জিগগেস করলাম, কোন্‌খানে ?

তৃপ্তির মধ্যে। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে তৃপ্তিও নেই।

আমাদের বিদ্বান নেতাকে ভালবাসতে পারবে না ?

কোনোদিন পারতুম কি না জানিনে, এখন শম্ভুর মতো মহাপ্রাণ লোকের সংগে থাকার পর আর পারব না।

লোকের চোখে শম্ভু একটা ছোটলোক রিক্সাওলা, আর আমাদের নেতা হচ্ছেন একজন বড়মানুষ, তাঁকে ভালবাসতে পারবে না তুমি ?

ধনীরা দরিদ্রদের ছোটলোক বললেই তারা ছোট হয়ে যায় না, তোমাদের নেতা কত বড়লোক তাও জানিনে। এটুকু জানি মানুষ ছোট হয় তার অসামাজিক ব্যবহারে, বড় হয় তার সুশিক্ষায়।

আমি বললাম, শম্ভুর কি আছে সেই সুরুচি সুশিক্ষা?

ধনী সম্ভ্রান্তদের মধ্যে এতটা দেখিনি। মা ম'রে যাওয়ার পর তোমাদের সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্তরা যখন আমার সর্বনাশের আয়োজন করছিল তখন এই শম্ভুই রক্ষা করেছে আমাকে, কিন্তু রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে চায়নি কোনোদিন।

বাসন্তীর কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু সান্যালদাকে আর শম্ভুকে কিছুতেই সমান মনে করতে পারলাম না। একজন বিখ্যাত বিদ্বানকে একটা রিক্সাওয়ালার সমান মনে করতে কেউ পারে না। বাসন্তী একান্ত অনন্যোপায় হয়েই শম্ভুর সংগে আছে মনে ক'রে আমি বললাম, আমাদের নেতা খুব ভালবাসবেন তোমাকে।

আমার ওপর একটা আকর্ষণ পুরুষের থাকা স্বাভাবিক, তাকে ভালবাসা বলা যায় না। দুজন দুজনকে শ্রদ্ধা করলেই ভালবাসতে পারে, সে শ্রদ্ধা আমার আর শম্ভুর মধ্যে আছে।

আমাদের নেতাও তোমাকে শ্রদ্ধা করবেন।

নাও করতে পারেন, আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা না করতে পারি। নিশ্চিত জায়গা ছেড়ে অনিশ্চিত জায়গায় যাওয়া কারও উচিত নয়।

বললাম, কালচার ব'লেও তো একটা কথা আছে?

ব্যবহারিক মাধুর্যের কথা বলছ? সেদিকেও শম্ভূর তুলনা সচরাচর মেলে না। সে অশ্লীল কথা বলে না, কারও নামকে বিকৃত ক'রে ডাকে না, পরের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে যায় না, রাস্তায় থুথু নোংরা ফেলে না, সবার পরে দোকানে গিয়ে সবার আগে জিনিস কেনার জন্য ধাক্কাধাক্কি করে না, চলে যাওয়া পুরানো বন্ধুর গোপন কথা নতুন বন্ধুকে বলে দেয় না।

তবু শম্ভুকে কেউ কালচারড্ মনে করতে পারবে না।

আসল্ কথা কি জান, দাদা, এক শ্রেণীর লোকের যত যোগ্যতাই থাক্ তোমরা তাদের কিছুতেই কালচারড্ মনে করতে পার না, আরেক শ্রেণীর লোকের যত দোষই থাক্ তাদের কিছুতেই আনকালচারড্ মনে করতে পার না। তারওপর আবার তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ ছোটবোনের ভবিষ্যৎ ভেবে। তুমি ভেবো না দাদা, আমি সুখী হবই।

এ বিষয়ে আর কোন কথা বললাম না। সান্যালদা যে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহান্বিত সেকথাও প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম, ঝির কাজটা তুমি ছেড়ে দাও।

এমাসেই আমার সেলাইর কলটা আসবে, তখন আর এসব কাজ করতে হবে না। আগে আমি সেলাইর কাজই করতুম, শম্ভু করত সাইকেল মেরামতের কাজ। বেশ ভালই ছিলাম। এমনসময় বাড়ীওয়ালার ছেলে আমাদের সবকিছু চুরি করে নিল। তারপর আমরা এসব কাজ শুরু করি।

সাহায্যের জন্য যা'ওনি কারও কাছে ?

না। শম্ভূকে আবার সাইকেলের দোকান দিয়ে দেব। তাকে একটু লেখাপড়া শেখাব, আমি ম্যাট্রিক পাশ করব, আর তুমি যতদূর ইচ্ছে পড়বে।

পরদিন রাত্রে লাইব্রেরী থেকে পড়াশুনা ক'রে বাসায় ফিরে এসে দেখলাম ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে একটা বেলার মধ্যেই বাসন্তী যেন অন্যমানুষ হয়ে গেছে। পাশের ঘরের মেয়েটি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তার মুখ থেকে সব শুনে আমিও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

দুপুরবেলা এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেমসাহেব শম্ভূর রিক্সায় চড়ে বাসায় যান। অমনি তাঁর স্বামী তাঁকে বেদম মারতে শুরু করেন। বেদনার্ত মহিলাটি অনন্যোপায় হয়ে শম্ভুকে বলেন, বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। সে তখন গিয়ে সাহেবকে ধ'রে বাধা দেয়। সাহেব ক্ষেপে গিয়ে তাকে এক ঘুষি মারে। বাসন্তী সে-বাড়ীরই একাংশে কাজ করত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেও সেই মহিলাটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। সাহেব তখন তাকেও এক ধাক্কা মারে। সংগে সংগে শম্ভূও সাহেবকে এক চপেটাঘাতে ধরাশায়ী ক'রে ফেলে। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে থানায় নিয়ে যায়।

তিনদিন পর্যন্ত বাসন্তীকে কেউ স্নানাহার করাতে পারল না। চতুর্থ রাত্রে সেই মেয়েটি বাসন্তীকে খাওয়ার

জন্য অনুরোধ করছিল। আমি কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বাইরে গেলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে জিগগেস করলেন, এটা কি শম্ভূর বাসা ?

হ্যাঁ।

আমার নাম রমানাথ, আলিপুরের উকীল। শম্ভূ আমার বাল্যবন্ধু। তার স্ত্রীর সংগে আমি একটু কথা বলতে চাই।

আপনি আমার সংগে আসুন।

তাঁকে বারান্দায় বসিয়ে বাসন্তীকে ডাকলাম। বাসন্তীকে দেখে তিনি সসম্ভ্রমে বললেন, দরকারী কাজে থানায় গেছিলুম। সেখানে দেখা হয়ে গেল শম্ভুর সংগে। আমি সব শুনেছি, এখন যেভাবে হোক শম্ভূকে বাঁচাতেই হবে।

বাসন্তী আমাকে দেখিয়ে বলল, এই আমার দাদা, ওর সংগে পরামর্শ ক'রে যা হয় করুন, উকিলদা।

আগে তুমি এই নোংরা বস্‌তি ছেড়ে আমার বাসায় চল। আশ্চর্য হয়ো না, শম্ভূ আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফীস্ যোগাড় করে না দিলে আমাকেও কুলিগিরিই করতে হ'ত।

আমার কর্তা তো আর আমি নই, যাব কিক'রে ?

শম্ভূর কথা ভাবছ ? সে শুনলে খুশীই হবে। আমি জানতুম না সে কোথায় আছে, নইলে অনেকদিন আগেই এসে তোমাদের সংগে দেখা করতুম।

আপনার দয়া চিরদিন মনে থাকবে, কিন্তু আপনি আমাকে মাপ করুন উকিলদা, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

অগত্যা উকিলবাবু উঠলেন। আমি বিস্মিত হলাম বাসন্তীর ব্যক্তিত্ব দেখে। কত শান্ত অথচ কত কঠিন। কোথায় পায় সে ধনী শিক্ষিত লোকদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার এমন শক্তি !

সকালবেলা বাজার থেকে ফিরে এসে দেখলাম উকিলবাবু আবার এসে বাসন্তীর সংগে কথা বলছেন। তিনি বাসন্তীকে বললেন, ফরিয়াদী পক্ষ তোমাকেই সাক্ষী মেনেছে, এখন তুমি কোর্টে কি বলবে ?

যা দেখেছি তাই বলব।

সত্যি কথা বললে শম্ভুর জেল হয়ে যাবে।

কপালে যা আছে তাই হবে।

কপালের কর্তা তো তুমি নিজে।

মিথ্যেকথা বলতে আমি পারব না, উকিলদা।

শিক্ষিত ভদ্রলোকরা যে অহরহ মিথ্যেকথা বলছে ?

শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অনেক কিছু সম্বল আছে, আমাদের যে ধর্ম বিনে কোন সম্বলই নেই।

একগুঁয়েমি ছেড়ে দাও, স্বামীকে তোমার বাঁচাতেই হবে।

মিথ্যেকথা বললে শম্ভু এ-জীবনে আমার মুখ দেখবে না।

নিজের হাতে তুমি নিজের স্বামীর সর্বনাশ করো না।

মেমসাহেব সত্যিকথা বললে বিশেষ কিছু হবে না, উকিলদা।

সে সত্যিকথা বলবে কেন তার স্বামীর বিরুদ্ধে ?

ভদ্রলোকের মেয়ে কি পারে মিথ্যেকথা বলতে ?

ভদ্রলোকের স্ত্রী কি পারে স্বামীর বিরুদ্ধে যেতে ?

আজও উকিলবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চ'লে গেলেন। বাসন্তীর শক্তি অদ্ভূত! সত্যের জন্য সে তার প্রিয়তমের আপাতঃ স্বার্থ বিসর্জন দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ভালবাসা খুব গভীর না হ'লে কোন প্রিয়জনই সাহস করে না এ কাজ করতে। অথচ আমি একদিন এই ভালবাসা থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে সান্যালদার হাতে দিতে চেষ্টা করেছিলাম। শম্ভু আমার এতবড় শুভার্থী, তার ওপর আমি কত বেইমানি করেছিলাম। বাসন্তীকে বললাম, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে ঠিক মিথ্যে কথাও হয় না. শম্ভুও রক্ষা পায়। তুমি বল তোমাকে মারতে দেখে শম্ভু গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ সাহেবকে মেরেছে।

আমার সন্ন্যাসিনী মামীমার ছেলে হয়ে তুমি এমন কথা মুখেও এনো না, দাদা। তিনি বলতেন মিথ্যে থেকে কারও কোন মংগল আসতে পারে না। জগতের লোক সত্যি জানলেও সেকথা সত্যি নয় যদি আমার মন সেটাকে মিথ্যে ব'লে জানে। শম্ভুও ভীষণ ঘৃণা করে এসব ছলা-কলার পথকে।

বাসন্তীর কথার কোন জবাব আমি দিতে পারলাম না। তার কথাগুলি সর্বান্তঃকরণে আমি সমর্থন করতাম। মিথ্যে থেকে যে কোন মংগল আসে না তা আমিও মানতাম।

শম্ভুর জীবনের চতুঃসীমানায়ও ছিল না কোনো ছলা কলা জটিলতা। সংসার সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল অতিশয় সরল, মানুষের সংগে তার ব্যবহার ছিল নিতান্ত সহজ। কোনো

কঠিন সুনীতি তার মাথায় ঢুকত না। সে বুঝত মানুষের জীবনের লক্ষ্য সুখ। সুখ সুবিধার মানদণ্ড দিয়ে সে বিচার করত কোন্ নীতি ভাল, কোন্ নীতি মন্দ। মানুষের সুখ আনতে আর দুঃখ ঘোচাতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করত। মেয়েদের সম্বন্ধেও তার ধারণা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মেয়েরা মানুষকে ছোট থেকে বড় ক'রে দেয় অনেক দুঃখ সয়ে, অতএব সবার উচিত তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া। যে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে সে মহাপাপী। যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে সে কৃতঘ্ন। স্ত্রী স্বামীর স্নেহশীলতা ও সুকোমলতার ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর বাড়ীতে এসে অতিথি রূপে আশ্রয় নেয়, তখন বাগে পেয়ে তার উপর পীড়ন করা পিশাচের কাজ। অনেক বিজ্ঞ লোক বলতেন, স্ত্রী অতিথিও নয়, পরও নয়, তার সঙ্গে একটু দুর্ব্যবহার করা এমন কিছু অন্যায় নয়, পাঁচটা ঘটি-বাটি এক সংগে থাকলে একটু ঠোকাঠুকি লাগেই। শম্ভু বলত, যত ঠোকাঠুকিই লাগুক, তার একটা সীমা থাকা উচিত, ঘনিষ্ঠতার যূপকাষ্ঠে শালীনতাকে বলি দেওয়া যায় না।

শম্ভুর কথা মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। সে ছিল উদাসী আপনভোলা প্রকৃতির মানুষ, বাসায় বেশীক্ষণ থাকতও না, বাসার কোন ব্যাপারে আসতও না। তবু তার একান্ত অভাবে কেমন একটা শূন্যতায় চারদিক হুহু ক'রে ওঠে। বাড়ীর অন্তরাত্মাটা যেন চিরতরে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে তার সঙ্গে। মনে পড়ে গৌরের কথা।

বাসন্তী আমাকে বলল, তুমি গিয়ে একটা ভদ্রলোকের মেস্‌এ থেকে পড়াশুনা করো দাদা, এখানে থাকলে কোনোদিনই বড়মানুষ হতে পারবেনা। আমি দুজায়গায় কাজ করলেই তোমার খরচ চালাতে পারব।

তোমারটা খেয়ে তোমাকেই ছেড়ে যাব ছোটলোক ব'লে ?

নইলে ভদ্রলোকেরা তোমার দুর্নাম করবে।

সে আমি বুঝব ।

অত সহজ নয় দুর্নাম সহ্য করা।

লোকের সমালোচনা এড়াতে সারাদিন বাসন্তীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগলাম। অমনি মার্ক্সিষ্টদের কাজকর্মের মধ্যে ডুবেও গেলাম। সাম্যবাদ কথাটার ওপর আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, মনে হ'ত মানুষে মানুষে যে বিভেদ দেখা যায় তা বাইরের, ভিতরে আছে সবার সংগে সবার মিল। সাম্যবাদের নামে আমায় কোনো কাজে ডাকলে আমি গিয়ে মনে প্রাণে যোগ দিতাম। সান্যালদার আহ্বানেও আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনিও আমার হৃদয়ে প্রবোধদার শূন্য আসনটি ভরে দিলেন।

কিন্তু শ্রমিকদের কাজ করতে করতে আর কলকাতা থাকতে থাকতে বড় শহর সম্বন্ধে আমার সব মোহ কেটে গেল। গ্রামে থাকার সময় শহর সম্বন্ধে মনে মনে কত স্বপ্ন পোষণ করতাম, সে শহরকেই আজ আমার মনে হ'ল সভ্যতার শত্রু ব'লে। বড় শহর, বড় কারখানা, আর বড় রাষ্ট্রকে তুলে

দিয়ে বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে না পারলে শান্তি আসবে না সংসারে। বড় শহরে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে সে কথা ঠিক, কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগাবার মতো সংগতি আছে ক'জনের? বড় শহর মানুষের জীবনের বেগকে বাড়িয়ে দেয় সত্য, কিন্তু সেই বেগবৃদ্ধির মূলনীতি হচ্ছে বহুর শোষণে স্বল্পের স্ফোটন। বহুলোক এক জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে থাকার ফলে তাদের দুঃখ কষ্টের ভিত্তির ওপর গ'ড়ে ওঠে স্বল্প লোকের বিলাসসৌধ। সাম্যবাদ ছাড়া এই শোষণ ব্যবস্থাকে রদ করার আর কোনো উপায় নেই। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। আমাদের শাস্ত্র বলে সকল মানুষ সমান, সকলের জন্য নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার মতো পুণ্য আর নেই। তবে কেন আমরা পারব না সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে?

মনের আনন্দে লেগে গেলাম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু আমার আনন্দ বিধাতা সইতে পারেন না বেশীদিন। যেখানেই জমে আসে আনন্দ সেখানেই বেজে ওঠে বেসুর। সকল মানুষকে সমান দেখার পথে আমি বাঁধা পেতে লাগলাম মার্ক্সিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকেই। রাষ্ট্রকে সাম্যবাদী করতে চাইলেও সকল মানুষকে সমান দেখেন না তাঁরা। স্বয়ং সান্যালদা একদিন আমাকে বললেন, মেয়েটিকে নিয়ে কুলিদের বস্তি ছেড়ে ভদ্রলোকের মধ্যে চলে এসো, নইলে প্রেষ্টিজ কালচার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি বললাম, ব্যক্তি নিয়েই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রকে সাম্যবাদী করতে হলে ব্যক্তিকে সাম্যবাদী করতে হবে, তারও আগে বিপ্লব-কর্মীদের নিজেদের জীবনকে সাম্যময় ক'রে তুলতে হবে।

এটা তোমার অবৈজ্ঞানিক কথা, ইউটোপিয়ান আইডিয়া।

সে যাক গে, এখন একজন ভাল উকিলের ব্যবস্থা করুন। রিক্সাওয়ালা একজন সাম্যবাদী কর্মী, ধনীর অত্যাচার থেকে তাকে বাঁচাতেই হবে।

কেন, সেই উকিলটির কি হ'ল ?

মেয়েটি তাঁর পরামর্শ শোনেনি ব'লে ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেছেন।

আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা, সান্যালদা ?

পার্টির ক্ষতি হবে।

এমন অসম্ভব কথাটা বলতে সান্যালদার মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, রিক্সাওয়ালাকে সাহায্য না করা কি ধনীর অত্যাচারকে সমর্থন করা নয় ?

পার্টির স্বার্থের জন্য অনেক কিছু করতে হয়।

দরিদ্রের পার্টি ধনীকে সমর্থন করলে পিছিয়ে যাবে না ?

দরকার হ'লে একটু পেছুতেও হয়। লেনিন বলতেন ওয়ান ষ্টেপ ব্যাকওয়ার্ড টু ষ্টেপস্ ফরওয়ার্ড। বড় লাভের জন্য ছোট ক্ষতি স্বীকার না করলে চলে না।

মনটা আমার বড় নিরাশ হয়ে গেল।

ষোল

নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে বাসন্তীকে নিয়ে আলীপুর কোর্টে গেলাম। ভয়ানক ভিড়, কোথায় কাব কাছে যেতে হবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। একজনের পর একজন দেশী সাহেব এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে। কেউ বলে, রাস্তা নষ্ট করেছিলে? কেউ বলে, বাতি ছাড়া সাইকেলে চড়েছিলে? কেউ বলে, মেয়েমানুষ ভাগিয়েছ? সবাই বলে, আমার কাছে চলে এস, সব ঠিক করে দেব। একজনকে জিগগেস ক'রে জানলাম এগুলি সব উকীল।

কোর্টের ঘরে গিয়ে বড় লজ্জা করতে লাগল। লোকে না জানি কত কিছু ভাবছে আমার আর বাসন্তীর সম্বন্ধে। এমনসময়ে শম্ভুকে এনে দাঁড় করানো হ'ল আসামীর কাঠগড়ায়। একজন উকিল খানিকক্ষণ কথা বলার পর হাকিম আসামীকে জিগগেস করলেন, তোমার নাম কি?

শম্ভু।

বাবার নাম?

জানি নে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। কত কঠিন কথা কত সহজ ভাবে সে বলে দিল। বাবার নাম জানে না বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জার আভাসও দেখা গেল না তার মধ্যে।

হাকিম বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

আমি আফ্রিকার কাফ্রি, এখন এ দেশে থাকি।

তোমার জাত কি?

মুসলমান।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শম্ভু যে বাংগালি নয়, হিন্দু নয়, ভারতবাসীও নয় একথা আমি তো দূরের কথা, বাসন্তীও জানে না। ভালবাসার কাছে কি জাত ধর্ম সবই তুচ্ছ!

হাকিম জিগগেস করলেন, তুমি এদেশে এলে কিক'রে?

জানি নে।

গত মাসের দুই তারিখ মংগলবার দুপুরে তুমি দশ নম্বর ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাসায় ঢুকেছিলে?

হাঁ হুজুর।

সাহেবকে মেরেছিলে?

হাঁ হুজুর।

কেন মেরেছিলে?

সাহেব মেমসাহেবকে জুতো দিয়ে মারল। মেমসাহেব কেঁদে আমায় বলল রুখতে। রুখতে গেলে সাহেব আমাকেও মারল। বাসন্তী আমাকে ধরে সরাতে এলে তাকেও মারল। তখন আমি একটা চড় মারলুম সাহেবকে।

বাসন্তী কি ও-বাড়ীর ঝি?

হাঁ হুজুর, অন্য ঘরের।

তোমার কি হয় সে?

ও বাজারের মেয়েমানুষ, আমি ওকে রেখেছি।

সহজ সরল স্পষ্ট উক্তি, লেশমাত্র জড়তা নেই কণ্ঠে। বাবার নাম না জানা, শাস্তি উপেক্ষা করা, মেয়েমানুষ রাখা সবই যেন অতি মামুলী ঘটনা। তার কথা শুনে বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, সকলে যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিও তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মাধুর্য নিয়ে। অনেকে নিছক সত্যভাষণের যশটুকুর জন্য লালায়িত হয়ে অনেকসময় নির্লজ্জ সত্যকথা বলে, তাদের বেলা কিন্তু সততার মাধুর্যের চেয়ে নির্লজ্জতার কদর্যতাটাই ফুটে ওঠে বেশী। সত্যকথা শুধু সত্যবাদীকেই মানায়। কোন্ এক নিগূঢ় নিয়ম বলে যেন সে সংসারের সাধারণ বিবেচনার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। কারও মনে কোনো প্রশ্নই জাগে না শম্ভূ হিন্দু কি মুসলমান, ভারতীয় কি অভারতীয়, সবাই জানে সে বাংগালী, সে সৎলোক।

হাকিম জিগগেস করলেন, এরকম কাজ আর করবে?

হাঁ হুজুর।

তুমি এর সাজা জান?

না হুজুর।

যদি ফাঁসী হয় তবু করবে?

হাঁ হুজুর।

এরকম সত্য কথা যে শুধু সত্যবাদীকেই মানায় তার আরেকটা দৃষ্টান্তও আমার মনে পড়ল। একবার গ্রামাঞ্চলে

সাঁওতালদের মামলা দেখছিলাম। হাকিম এক সাঁওতালী যুবককে জিগগেস করলেন, তোর নাম কি ?

ভোলা।

তোর বাবার ন্যম ?

তা তুই একটা ভেবে নে না।

না. তুই বল্।

তা - তা - এ - এ - ভরত।

পদা তোর কে হয় ?

কাঠবাবা।

কাঠবাবা কি রে ?

তা বুঝতে লারছিস্! ধর্ তোর বাবা মরে গেল, তোর মা আমায় সাংগা করল, এখন আমি হলুম তোর কাঠবাবা।

সেদিন সাঁওতালী যুবকের সংস্কারমুক্ত সরল মন থেকে সে বিশ্রী কথাগুলিও এমন অপরূপ মাধুর্য নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল যে অন্য সকলের সংগে সংগে হাকিম পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আজও কোর্টের সকলে তেমনি মুগ্ধ হয়ে গেল শম্ভুর কথা শুনে।

বাসন্তীকে এনে দাঁড় করানো হ'ল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। হাকিম তাকে জিগগেস করলেন, তুমি গতমাসের ছুই তারিখ মংগলবার দশ নম্বর ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গেছিলে ?

গেছিলুম ধর্মাবতার।

কেন গেছিলে ?

বাসন মাজতে।

শম্ভু বাড়ীর মালিককে মেরেছিল ?

হাঁ, ধর্মাবতার।

অকস্মাৎ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল কোর্টের মধ্যে। কে একজন বলল সুপারিনটেন্‌ডেন্‌ট্‌ সাহেব এসেছেন মেমসাহেবকে নিয়ে। হাকিম সসম্ভ্রমে তাকালেন সেদিকে। আমিও তাকালাম। চক্ষু আমার স্থির, মিষ্টার সান্যাল আর প্রভাদি ! সমস্ত দেহটা আমার কাঁপতে লাগল।

মিষ্টার সান্যাল হাকিমকে বললেন শম্ভু তাঁকে ফেলে দিয়ে তাঁর মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, অন্যালোকেরা এসে তাকে ধরে ফেলেছে। হাকিম জিগগেস করলেন, সে কি আপনার স্ত্রীর সংগে গেছিল ?

না।

হাকিম তারপর প্রভাদিকে জিগগেস করলেন, আপনার স্বামী আপনাকে প্রহার করেছিলেন ?

না।

শম্ভু আপনার স্বামীকে প্রহার করেছিল ?

হাঁ।

কেন ?

তাঁর পকেট থেকে মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল।

আপনার স্বামী বাসন্তীকে ধাক্কা দিয়েছিল ?

না।

দরজার কাছে ধপাস্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। সবার সঙ্গে আমিও সেদিকে চোখ ফেরালাম। কয়েকজন আর্দালি এসে মূর্ছাগতা বাসন্তীর এলায়িত দেহটাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। যদি প্রভাদি দেখে ফেলেন পতিতাটার সংগে আমার পরিচয় আছে সে ভয়ে আমি তখনি বাসন্তীর কাছে ছুটে যেতে পারলাম না। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল পাষাণ শম্ভুর চোখ থেকে।

হাকিম রায় দিলেন। শম্ভুর জেল হয়ে গেল।

সতের

বাসন্তী ঝির কাজ ছেড়ে সেলাইর কাজ ধরল। আমিও পত্রিকা বেচতে শুরু করলাম। কিন্তু বস্তির জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল আমার কাছে। এই দরিদ্র অশিক্ষিতদের মধ্যে থাকলে জীবনের কোনো আশাই যে পূর্ণ হবে না। সত্যাগ্রহী, বিপ্লবী, সাম্যবাদী সকল শ্রেণীর লোকরাই নেতা প্রতিনিধি নির্বাচনের বেলা বিলাতফেরতা বা উপাধিধারী লোককেই করে।

এমনদিনে উকিলদা এসে জোর করেই আমাদের তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর খালি বাসাটাতে। বেশ কাটতে লাগল দিনগুলি। হঠাৎ বাসন্তী একদিন আমাকে বলল, তুমি গিয়ে কোনো একটা মেস্এ থাক, দাদা।

কেন ?

এক বাসার মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া এরকম অবস্থায় একটা ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে থাকলে দুর্নাম হবে না ?

মনে পাপ না থাকলে দুর্নাম টেকে না বেশীদিন।

তা হোক, তুমি যাও।

কুলোকরা তোমাকে বিরক্ত করবে না আমি চলে গেলে ?

মেয়েদের মনের সায় না পেলে কোনো পুরুষ আসে না তাদের বিরক্ত করতে। আগে আমাদের বাসা যেখানে ছিল সেই শহরেই সান্যালসাহেবও কাজ করত। তখন থেকেই আমি জানতাম তাকে। সে আমাকে বিয়ে করার লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছিল তাতেও তো কিছু হয় নি।

বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। যে আমাকে চায় না তার কাছে থাকব না। হনহন্ ক'রে হেঁটে চললাম মেসের দিকে। কিন্তু স্নেহ বড় সাংঘাতিক জিনিস। কোথায় তলিয়ে গেল আমার রাগ দ্বেষ। বাসন্তীর ভাল মন্দ'র চিন্তা এসে আমার মনটাকে জুড়ে বসল। কিন্তু কি করব ? যে আমাকে রাখতে চায় না তার কাছে থাকতে চাইব কিক'রে ? আমি তার সুবিধার দোহাই দিলেও সে কেন মেনে নেবে আমার কথা ?

সমীর !

মাথা তুলে চাইলাম। আবার ডাক এল, সমীর, ওপরে উঠে আয়। প্রভাদি ! সেদিন কোর্টে তাঁর মিথ্যাচার দেখে তাঁর বিরুদ্ধে কত কথা ভেবেছি, মনে মনে বলেছি এমন মানুষের

সংগে কথা বললেও পাপ হয়। তবুও তাঁর ডাক শুনে কাছে না গিয়ে পারলাম না। ঘরে গেলে তিনি বললেন, তুই আমায় বাঁচা, সমীর। তাঁর দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

আমি তো আহাম্মক, গর্বিতা প্রভাদির চোখে জল, আমার মত হতচ্ছাড়া লোকের কাছে তাঁর এমন আকুল আবেদন! প্রণাম ক'রে বললাম, কি হয়েছে প্রভাদি? তিনি তাঁর পিঠ থেকে জামাটা তুলে ধরলেন। গা-টা শিউরে উঠল সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে। কাঁচা হলুদের মতো উজ্জ্বল, মাখনের মতো কোমল পিঠখানি রক্তাক্ত হয়ে আছে চাবুকের ঘায়ে।

প্রভাদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এরকম সারা গায়ে। আরও দেখাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাতটা ধ'রে ফেলে জিগগেস করলাম, কি'করে এমন হ'ল, প্রভাদি?

সান্যাল মেরেছে।

কি বলছ তুমি!

আগেও মারত, কয়েকদিন হয় বড্ড বেশী বেড়ে গেছে।

বাজর্গা চিঠি লিখে দেব?

গাড়ী নিয়ে আয়, তোর সঙ্গে চলে যাব তোর বাসায়।

সান্যাল আরও রাগ করবে না?

তাতে কিছু এসে যাবে না, তাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি, এখন অন্য জায়গায় উঠে যাওয়া দরকার।

স্বামী ছেড়ে চলে যাবে?

হ্যাঁ।

তার চেয়ে বরং বড়মামীমাকে চিঠি লিখে দিই।

না, সান্যালকে সবার মতের বিরূদ্ধে গোপনে বিয়ে করার পর আর কাউকে কিছু লেখার মুখ নেই আমার।

হিন্দু-মেয়ে স্বামী ছাড়বে ভাবতেও বিশ্রী লাগল। দিদির চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। পিঠখানি তাঁর অনাবৃতই ছিল। আমার মনে পড়ল তিনি কত শালীনতাপ্রিয় ছিলেন। ছেলেরাও ঠিকমতো জামা গায়ে না দিলে তাঁর বিরক্তির সীমা থাকত না। অসময়ে প'ড়ে সেসব ভুলে গেছেন। আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বললাম, আমায় সব খুলে বল, সান্যালকে মজা দেখাব।

এত উত্তেজিত হলে কিছু বলব না তোকে।

না, বলো তুমি।

বিয়েব পরই টের পাই সে খুব মদ খায়, আর অনেক খারাপ রোগ আছে তার শরীরে। আমি সাবধান হয়ে যেতে সে আমার উপর ক্ষেপে গেল। তারপর টের পেলাম সে লেখাপড়া শেখেনি কিছুই, চাকরি পেয়েছে লণ্ডণে ভারতীয় ছাত্রদের নামে পুলিশের কাছে রিপোর্ট দেওয়ার পুরস্কার বাবদ।

লেখাপড়া না জানলে এতবড় চাকরী ক'র কিক'রে ?

প্রভাদি বললেন, এসব কথা জেনেছি ব'লে সে আমাকে মারতে শুরু করে। সেদিন একটা মামলায় মিথ্যে সাক্ষি দিতে প্রথমে রাজী হইনি ব'লে মারপিট আরও বেড়ে গেছে। তাও একরকম সহ্য করতাম, এখন আবার শুরু হয়েছে আরেক উপদ্রব।

কি ?

একটা ফিরিংগি নার্সকে এনে ঘরে রাখে, আমাকে বলে ক্লাবের একটা খারাপ লোকের সংগে গিয়ে বন্ধুত্ব করতে।

কেন ?

তার কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা ধার করেছিল সেটা যাতে ফেরত না চায়।

চাইবে না কেন ?

তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি নে। যা, গাড়ী নিয়ে আয়।

সান্যাল যে কত ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ছিল ?

তার সব ধর্মানুরাগ ছিল মানুষ ভোলাবার ছল।

একটা লোক শুধুমাত্র প্রতারণাকে মূলধন ক'রে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একথা ভাবতেও সমগ্র মানবসমাজের বুদ্ধির ওপর ধিক্কার এল। সুনীতি সুবুদ্ধির কি কোনো ক্ষমতাই নেই প্রতারণার বিরুদ্ধে ? স্বার্থ সম্বন্ধে হুশিয়ার বড়মামীমাই বা এই প্রতারণার কবলে পড়লেন কি ক'রে ? মার্ক্সিষ্ট পার্টির সত্যনিষ্ঠ কর্মীরাই বা সান্যালকে চিনতে পারেন না কেন ? নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে অসাধারণ বিদ্যে আছে। আমাকে নিশ্চল নিঃশব্দ দেখে প্রভাদি বললেন, গাড়ী নিয়ে আয়।

আমি বেরোলাম গাড়ী আনতে। কিন্তু মনে মনে কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারলাম না কি করব। প্রভাদিকে এমন বিপদে একা ফেলে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু নিয়েই বা যাব কোথায় ? তিনি যখন শোনবেন আমি একটা পতিতার

সংগে থাকি তখন কি অবস্থা হবে? আর বাসন্তী যখন শুনবে তার পরম শত্রু আমারই বোন তখন সে-ই বা কি ভাববে? ভয়ে ভয়ে আমি এসে বাসন্তীকে সব বললাম। বাসন্তী একটুও রাগ না ক'রে সাগ্রহে আমার সংগে চলল প্রভাদিকে নিয়ে আসতে। পথে বললাম, এতদিন সহ্য করা উচিত হয়নি, প্রভাদি তো আর অন্য মেয়েদের মতো অসহায় নন।

বাসন্তী বলল, দুর্নামের ভয়ের কাছে সব মেয়েই সমান অসহায়। স্বামী ছেড়ে গেলে লোকে দুর্নাম করেই, তখন মেয়েদের বাঁচা হয়ে ওঠে অসম্ভব।

দুর্নামকে সবাই ভয় পায়, তার আবার মেয়ে পুরুষ কি?

মেয়ে পুরুষে অনেক তফাৎ। পুরুষের দুর্নাম রটলে কোনো মেয়ে মেশে না তার সংগে। মেয়ের দুর্নাম রটলে পুরুষদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কে আগে আসবে তার কাছে। এজন্যই শত অসুবিধা হলেও মেয়েরা চায় একজনকে অবলম্বন ক'রে থাকতে।

বাজে কথা। ঘৃণা শুধু মেয়েদেরই আছে, পুরুষদের নেই?

খুব আছে, কিন্তু পুরুষদের ঘৃণা মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে সামাজিক মর্যাদা দেবার বেলায়, ভোগ করার বেলায় নয়।

প্রভাদির বাসায় এসে আমি ভিতরে চলে গেলাম। তিনি সান্যালের দেওয়া সবকিছু ছেড়ে রেখে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে একটা খাবার তৈরী ক'রে সাজিয়ে রাখছিলেন। আমি বললাম, এখনও এত চিন্তা ওর জন্যে?

তিনি বললেন, আর তো দেব না কোনোদিন রান্না ক'রে।

আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম এই স্নেহটুকুর অভাবে প্রবোধদার জীবনটা শূন্য হয়ে রইল চিরতরে। এত সুষমা লুকিয়ে ছিল তোমার হৃদয়-শতদলে, ক্ষণিকের মোহ এসে ব্যর্থ করে দিল সব। সভয়ে বললাম, শম্ভুর স্ত্রী বাসন্তী এসেছে তোমাকে নিতে। আশ্চর্য, তিনিও রাগ করলেন না। সানন্দে রওনা হলেন বাসন্তীর সংগে।

আমরা তিনজনে এক নতুন জীবন শুরু করে দিলাম। প্রভাদি টুইশনি করেন, বাসন্তী সেলাই করে, আমি পত্রিকা ফেরি করি। নতুন সংসারের তাড়াহুড়ায় আমার মেস্‌এ যাওয়ার কথাটা চাপা পড়ল।

আমি কিন্তু ভুললাম না কথাটা। বাসন্তী আগেই আমাকে সরাতে চেয়েছিল, এখন আবার প্রভাদির কাছে শুনবে আমার দুর্নামের কথা। দুজনেই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আমাকে পূর্বপরিচিত পরিজনদের কাছ থেকে সরে যেতেই হবে।

অনেক চেষ্টার পর রহমান নামে এক খালাসির সংগে আলাপ ক'রে তার কাছ থেকে কথা আদায় করেছি সে আমাকে জাহাজে কাজ দেবে। বাসায় এসে প্রভাদিকে বললাম, আমি বিলাত যাব। তিনি যেন চমকে উঠলেন। আমাদের দুবোন একভাইয়ের সংসারটা এখন জমে উঠেছে। সকলেই পূর্ণোদ্যমে লেখাপড়া শুরু করেছি। ঠিক হয়েছে আমি এখানে থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব। শম্ভু জেল থেকে

চিঠি লিখেছে একজন রাজবন্দীর কাছে সে লেখাপড়া করছে। বাসন্তীও ম্যাট্রিক দেবে আমার সংগে। আমি না থাকলে অসুবিধা হবে। তাছাড়া আমি প্রবোধদার স্নেহের পাত্র ছিলাম ব'লে অনুতপ্তা প্রভাদি তাঁর সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে চান আমার ওপর। বললেন, কেন যাবি বিলাত?

ওখানে না গেলে জীবনে কোনো উন্নতি হবে না।

তা ঠিক, চাকরি যোগাড় করার সুবিধে পাবি।

শুধু চাকরি, শিক্ষা দীক্ষার সুবিধা কি কম পাব?

সে আশা করলে নিরাশ হবি।

তার মানে?

মানে বহু আছে। এটুকু জেনে রাখ যে বিলাত-ফেরতা ভারতবাসী প্রায় সবই মিথ্যেবাদী হয়ে যায়।

বিলাত-ফেরতাদের ওপর তুমি ক্ষেপে গেছ, নইলে এও কি সম্ভব যে ইংরেজের মতো এতবড় একটা জাত সত্যিকথা বলে না?

অমি তো বলিনি সেকথা। বিলাতবাসীরা সত্যিকথা বলে, ভারতবাসীরাও বলে। বিলাতফেরতা ভারতবাসীরা বলে না।

সে আবার কি?

ভারতবাসীরা সত্যিকথা বলে ধর্মবোধ থেকে, বিলাত-বাসীরা সত্যিকথা বলে প্রয়োজনবোধ থেকে। ও-দেশের নতুন পরিবেশে প'ড়ে ভারতবাসী হারিয়ে ফেলে ধর্মবোধটুকু কিন্তু গড়ে তুলতে পারে না প্রয়োজনবোধটুকু, তাই মিথ্যেকথা বলতে কোনো সংকোচ আসে না তাদের মনে।

তুমি যে বিলাত-ফেরতা, তুমি তো মিথ্যেকথা বল না ?

শম্ভু বাসন্তীকে দেখার পর থেকে আর বলিনে।

বাসন্তী লজ্জায় মরে গিয়ে প্রভাদির পায়ের ধূলা নিল।

আমি বললাম, প্রবোধদা যে মিথ্যেকথা বলেন না ?

তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কথা ছেড়ে দে।

কেন তাঁর সংগে ওরকম করলে, তিনি থাকলে কত ভাল হ'ত।

প্রভাদির চোখ দুটি সজল উদাস হয়ে উঠল। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, ছোটবেলা থেকে বাইরের অনুষ্ঠান আড়ম্বরটাকে বড় বলে মানতে মানতে অন্তরটাকে ক'রে ফেলেছি ছোট। কারও প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে হ'লে আবেকজনের প্রতি ঘৃণা দেখিয়ে করি, হৃদয়ের প্রাচুর্য দিয়ে করতে পারি নে। সান্যালকে শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য তাঁকে যে কত অপমান করেছি তার ঠিক নেই।

প্রবোধদা কিছু বলতেন না তোমাকে ?

বাড়ীতে ডেকে এনে বাগে পেয়ে তাঁকে যত অপমান করেছি, সব তিনি নীরবে সহ্য করতেন। যখন সান্যালের বাড়াবাড়ি গোপন করার জন্য মিথ্যেকথা বলতে শুরু করলাম তখনই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর আশা ছিল আমাকে লেখিকা ক'রে তুলতে পারলেই সব দুঃখ কষ্ট সার্থক হবে, কিন্তু তাঁকে ছোট ক'রে সান্যালকে খুশী করার জন্যে আমি ছেড়ে দিলুম লেখাপড়া।

কেন তুমি এত বিরূপ হয়ে উঠেছিলে তাঁর ওপর ?

তিনি লেখাপড়ার জন্য আমাকে বকুনি দিলে মায়ের আভিজাত্যে বড় লাগত। সান্যালও তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলত, আমি সে নির্জলা মিথ্যাগুলি পুরোপুরিই বিশ্বাস করতুম।

তাঁর মতো বিপ্লবী কি'করে এত ভালোবেসেছিলেন, প্রভাদি?

আদর্শবাদী চরিত্রবান লোকেরা পরের সেবায় যতই কর্মক্ষম হোন না কেন, নিজের বেলায় তাঁরা বড় নিঃসহায় নিঃসংগ। অন্তর তাঁদের উন্মুখ হয়ে থাকে প্রিয়জনের কাছে ধরা দিতে।

আগুনে পুড়ে প্রভাদির স্বভাবের খাদটা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন মিলন হলে প্রবোধদার ভাগ্যে খাঁটি সোনাটুকু জুটবে। আমি মনে মনে ভগবানকে বললাম আবার যেন প্রবোধদা ও প্রভাদির মধ্যে মিলন হয়। নইলে সমাজ বঞ্চিত হবে এত্তুটি মানুষের অসাধারণ কর্মশক্তি থেকে।

বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় প্রভাদির জিত হ'ল। একদিন উকীলদা বললেন, পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একজন টিচার আর একজন মাট্রন চাই, ইচ্ছে করলে প্রভা বাসন্তী দুজনেই কাজ পেতে পারে। আমি তখনি বক্স নম্বরটা সংগে নিয়ে চলে এলাম বাসায়। তারপর দুখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে উকীলদার কাছে দিলাম।

অনেকরাত্রে বাসায় ফিরে শুয়ে পড়লাম। বোনদুটির সুখবরে হৃদয়ের নিভৃতে একটা গভীর স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি বারান্দায় শুতম। বৃষ্টিতে সে জায়গাটা ভিজে যাওয়াতে উঠে এসে প্রভাদিদের দরজার কাছে পড়ে রইলাম।

শেষরাত্রির দিকে কানে এল তাঁদের কথাবার্তা। প্রভাদি বললেন, সমীরকে তুমি মেস্‌এ যেতে বলেছিলে কেন?

কেমন বিশ্রী যেন মনে হচ্ছিল তার হাবভাব।

তোমার সংগে কিছু করেছিল?

তা নয়, তবে মেয়েমানুষের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকত।

যে কোনো মেয়ের দিকে?

পাশের বাসার শিক্ষয়িত্রীর দিকে, আর মোড়ের বাসার নার্সের দিকে। আপন মনে কি যেন ভাবত, আমার বড় ভয় করত।

কোনো অভদ্রতা করেছিল?

না, তা করেনি।

আমার মনে হয় তুমি ওর ওপর ভুল ধারণা করেছ, বাসন্তী।

কেন?

সমীর চাঁপাকে খুব ভালবাসত। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে সে তাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। ও-মেয়েদুটির সংগে চাঁপার চেহারার মিল আছে, তাই বোধহয় সে তাদের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে চাঁপার কথা ভাবতে থাকে।

এসব কথা তো সমীরদা বলেনি কোনোদিন?

অভিমানী ছেলেরা কি নিজের দুঃখের কথা মুখ ফুটে অন্যকে বলতে পারে?

কিন্তু দোষ না করলে বাড়ী থেকে কেন তাড়িয়ে দেবে?

আমার মা'র চেষ্টা ছিল সমীরকে কাকুর চোখের বিষ ক'রে ওর পড়ার টাকাটা বারীনের জন্য খরচ করা।

দোষ না করলে মিছিমিছি তো আর কাকুকে লিখেন নি।

তা হয়তো করেছিল।

আমার সংগেও তো তা করতে পারত, দিদি।

তবু আমার একটা দৃঢ়বিশ্বাস সমীর জীবন গেলেও অন্যায় করতে পারে না।

আমার ও ছিল সে-বিশ্বাস, এখন দেখছি সবই সম্ভব।

আমি চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। আকাশে একটা তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্বলছে। তার উদ্দেশে যুক্তকর কপালে স্পর্শ ক'রে বললাম, ঠাকুর, আমার বোনদের রক্ষা করো। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আশা ত্যাগ ক'রে নিঃশব্দে পথে নেমে খিদিরপুরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রহমানের সংগে দেখা হলে সে বলল আমাকে বিলাতযাত্রার আগে তার সংগে কিছুদিন থাকতে হবে।

আঠার

জাহাজের বয় হয়ে বিদেশযাত্রা শুরু করলাম। এবার সত্যি বিলাত যাব। লেখাপড়া শিখব, দেশকে স্বাধীন করব। মানুষে আমার দিকে বিলাতফেরতা ব'লে চেয়ে থাকবে।

একদিন রহমান বলল, বিপদে পড়লাম যে সমীব-ভাই।

সভয় বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, কি ?

পুলিশের ভয় আছে, জলের ফেরিটাতে পাড়ে চইলা যাও।

কোথায় যাব ?

আমি ফেরির সারেংগকে বইলা দেই, সে তোমার চাঁদপুর যাওয়ার ব্যবস্থা কইরা দিব। সেইখান থেইকা চাটগাঁ যাইবা।

পয়সা পাব কোথায় ?

এই বাক্সটা মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিলে তোমাব ভাড়া সে-ই দিব। টাকা রাইখা গেছে আমার কাছে।

আবার তোমার দেখা পাব কোথায় ?

সমুদ্রের মুখে যে বাতি-ঘর আছে তার কাছেই আমার বাড়ী, সেইখানে খোঁজ করবা।

আমি নেমে গেলাম।

অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে শেষে এসে চাটগাঁ রেলষ্টেশনে পৌঁছলাম। নতুন জায়গার বিস্ময়ে বিভোর হয়ে গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকাতে লাগলাম।

বাক্সটা নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, গেটের মধ্যে চেকার বলল, বাক্সের ওজন বেশী জরিমানা দিতে হবে।

আমি বললাম, ওজন বেশী নয়, আমি দেখেছি।

বেশ, চলুন ওজন করিগে।

বেশ, চলুন।

থাক, গোলমালে কাজ নেই, একটা টাকা দিন ছেড়ে দিচ্ছি।

এক পয়সাও দেব না।

তাহলে আপনাকে হয়রাণ হতে হবে।

আমি বললাম, ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে দেব।

সে বলল, বেশ, আটআনা দিন।

এক পয়সাও না।

এমনসময় আরেকজন কর্মচারী এসে বলল, আমরা সব মালেই কিছু পেয়ে থাকি, আপনি চারআনা দিয়ে যান। শুনে বড় রাগ হ'ল আমার। আবার মনে হ'ল খুব অভাবে পড়েই এরা পয়সা চাইছে। আমি একটা সিকি দিলাম তার হাতে। সে যারপরনাই খুশী হয়ে সেটা পকেটে পুরে রাখল।

মালিকের বাসায় বাক্সটা পৌঁছিয়ে দিলাম। এখন কোথায় যাব? কোথায় থাকব? খাব কিক'রে? কবে আমার জাহাজ আসবে ঠিক নেই। সংগে সম্বল মাত্র বারআনার পয়সা।

ভয়ানক খিদে পেল। তবু পয়সা ফুরিয়ে যাবে ভয়ে কিছু কিনে খেতে ভরসা পেলাম না। মনকে ভুলিয়ে রাখতে ষ্টেশনের বইয়ের দোকানে এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম।

'মডার্ণ-ষ্টুডেন্ট" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটা এক ভদ্রলোক পড়ছেন। লেখাটার নাম 'রোড টু পিস্'। জানা-জানা মনে হচ্ছে। ওই-যে লেখিকার ছবি। চাঁপামাসীমা!

বারআনা দিয়ে কিনে ফেললাম পত্রিকাটা। কিন্তু পয়সাটা খরচ ক'রে ফেলে বড় অনুশোচনা হতে লাগল। রোজগারের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলাম। কতগুলি কুলি রেল-লাইনের কাছে পাথর ফেলছিল, সেখানে গিয়ে চাকরি চাইতে তারা বললে সমুদ্রের ধারে কিছু কুলির দরকার।

অনেকক্ষণ হেঁটে সন্ধ্যাবেলা এসে দেখি নির্জন সমুদ্রতীর, কেউ কোথাও নেই। পা বন্ধ হয়ে গেল, চোখ স্থির হ'ল। অসীম মহাসমুদ্র, বিপুল মহাতরংগ, বজ্রগম্ভীর কল্লোলধ্বনি! আশৈশব কত শুনেছি মহাসাগরের কাহিনী, কত দেখেছি রোমাঞ্চময় স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন-দেবতার চরণমূলে আমি উপনীত। কোথায় ধুয়ে মুছে গেল আমার মনের গ্লানি। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অগাধ অপার সুনীল জলধি পানে। ঊর্ধ্বে আকাশ, নিম্নে আকাশ, ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দণ্ডায়মান আমি।

ব'সে প'ড়ে মডার্ণ-ষ্টুডেন্টটা সযত্নে খুলে সামনে রেখে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম মাসীমার মুখখানির দিকে। সাগরের বিপুলতার সংগে তাঁর অন্তরের বিপুলতার কি-যেন নিগূঢ় সংযোগ আছে। সুনীল অতল স্নিগ্ধতার সংগে কি যেন মনোরম মিল আছে স্নেহময়ীর চোখদুটির। পায়ের মধ্যে জলের ছাঁট লাগতেই বুকটা আমার কেঁপে উঠল ভয়ে। মহাসমুদ্র যদি মুহূর্তের খেয়ালে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলে তবে কি পরিণতি হবে আমার! কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ মানবের জীবন, কত উদ্ধত তার আশা আকাংখা গর্ব। মানুষ তো ছার, সমগ্র ধরিত্রীটাকেই যদি মহাসমুদ্র গ্রাস করে ফেলে তাহলে কোথায় যাবে তার এতকালের সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম সাধনা প্রেম?

কিন্তু সমুদ্র যত বড়ই হোক, আপনা থেকে তো আর সে আসেনি, কেউ না কেউ তাকে সৃষ্টি করেছেই। যত শক্তিই সমুদ্রের থাক, তার চেয়ে তার স্রষ্টার শক্তি আরও বেশী। কে

সেই স্রষ্টা, কোথায় আছে তাঁর মহাশক্তির উৎসমূল? হে শরম-রাগরঞ্জিত সায়াহ্ন-তপন, তুমি নিয়ে যাও আমার অন্তরাত্মার সহস্র কোটি প্রণাম সসাগরা ধরিত্রীর সে সৃষ্টিকর্তার চরণমূলে।

কার ধ্যান করচ মুনিঠাকুর?

চমকে উঠলাম কোন্ এক তরুণীর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বরে। হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম তাঁর মুখ দেখে। ঝর্ণার মতো স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল চোখদুটি চেয়ে চাঁপামাসীমা হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইলেন নিজের ছবিখানির দিকে। আমি বললাম, মাসীমা! তিনি তাড়াতাড়ি মডার্ণ-ষ্টুডেণ্টটা আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। এতকাল পরে দেখা, তবু তাঁর সহজ ভাব দেখে মনে হ'ল যেন আমরা একসংগেই থাকি। বললাম, তুমি এখানে মাসীমা?

সমুদ্র দেখতে এসেছি।

কোথায় থাক?

সন্ধ্যার কাছে থেকে আই-এ পড়ি।

সন্ধ্যাবৌদি এখানে থাকেন?

তোমার শৈলেনদা রেলের ইঞ্জিনিয়ার এখানে।

আমার মুখ থেকে ক্ষণিকের আনন্দ ও বিস্ময় মুছে গেল। ভয় হ'ল আবার কোথায় এসে পড়লাম। কোনো কথা বেরোল না মুখ থেকে। পায়ের শব্দে ফিরে চেয়ে দেখলাম বৌদি আর মঞ্জু। তাদের সে-কি ফুর্তি আমাকে পেয়ে। বৌদি বললেন, আমি জানি তুমি আমাদের ভুলে থাকবে না, খোঁজ

ক'রে একদিন আসবেই। মঞ্জু বলল, আমি জানি শেষরাতের স্বপ্ন ফলবেই। বৌদি বললেন, আজ শেষরাতে চাঁপা তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিল ঠাকুরপো। মঞ্জু বলল, আমি না বললে এখানে বেড়াতে আসাও হ'ত না, সমীরদাকেও আর পেতাম না।

ভাবলাম কোথাও পালিয়ে যাব। পারলাম না। জোর ক'রে কড়া পাহাড়ায় তাঁরা আমাকে বাসায় নিয়ে এলেন। শৈলেনদা খুব খুশী হলেন। আবার লেখাপড়া শুরু করলাম।

ম্যাট্রিকের পড়ার সংগে শৈলেনদা আবার জুড়ে দিলেন ব্যাংকিং ও জার্ণেলিজম্ পড়া। বিলাতেব সংগে ব্যবস্থাও ক'রে ফেললেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। আমার জীবন আরেক নতুন ধারায় বইতে শুরু করল। একটু আনন্দের আভাস পেলেই আমার আর অতীতের কোনো গ্লানি মনে থাকে না।

অবসর সময়ে আমাদের একমাত্র কাজ বাগযুদ্ধ করা। দাদা মঞ্জু মাসীমা এক পক্ষে, বৌদি আর আমি এক পক্ষে। এতদিন সবাই বৌদিকে নিরীহ পেয়ে বড় জব্দ করতেন, আমি আসার পর থেকে উল্টো তাঁরাই জব্দ হয়ে যান। বৌদির গর্বের আর সীমা থাকে না। দাদাকে বলেন, তোমার ভাই তোমার চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসে।

মঞ্জু বলে, সমীরদা না থাকলে তোমাকে রক্ষা করবে কে?

মাসীমা বলেন, সমীরের ভালবাসা বিশ্বাস করো না।

দাদা বলেন, শয়তানের ওপর নির্ভর করো না।

বৌদি জবাব দেন, ঠাকুরপো শয়তান নয়, তোমরাই তা।

দাদা বলেন, শেষপর্যন্ত সমীর ওর ভাইবোনদের পক্ষ নিয়ে তোমাকে পথে বসাবে।

বৌদি বলেন, কিছুতেই না. ঠাকুরপো সেরকম লোকই নয়।

মানুষের জীবনে একটা লগ্ন আসে, তখন আনন্দকে সে যত নিবিড়ভাবে পায় অন্যসময়ে শত আয়োজনেও সেরকম পায় না। আমাদের জীবনে সেই আনন্দ-লগ্ন এসেছে। চট্টগ্রামের পরিবেশটিও হয়েছে তার একান্ত অনুকূল। সবই আমাদের চোখে সুন্দর লাগে, মনে ভাল লাগে। আপন পর কারও অকল্যাণ আমরা ভাবতেও পারিনে। জীবন বয়ে চলেছে একটা বিচিত্র মধুর সংগীতধারার মতো।

পরের শনিবার। বেলা প্রায় একটা বেজে গেছে। দাদা অফিসে আছেন, মঞ্জু আর মাসীমা এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। বৌদি খাওয়ার শেষে কাজকর্ম সারছেন। আমি পথের ধারে আমার পড়ার ঘরটায় বসে লেখাপড়া করছি, কখনও বা জানালা দিয়ে দাদার আসার পথে তাকাচ্ছি। পথটা সোজা চলে গেছে দাদার অফিসের দিকে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় এখানে ব'সে। সমুখে শরতের নীলাকাশ মনকে নিয়ে যায় কোন্ স্বপ্নময় মুক্তির দেশে।

বৌদি এসে বললেন, এত লেখাপড়া কর কেন ঠাকুরপো ?

বললাম, পরীক্ষায় পাশ করতে হবে না।

তোমার এত মাথা তবুও পাশের জন্য এত পড় কেন ?

একটু বিদ্যে না হলে কি হয় ?

পরীক্ষায় পাশ করলে আবার বিদ্যে দিয়ে কি হবে?

বিদ্যে না থাকলে মনে জোর পাওয়া যায় না।

তুমি ঠিক তোমার দাদার মতো। একটুও বুদ্ধি নেই তোমার। বিদ্যে তো সুখের জন্য, সুখ নষ্ট হলে কি হবে বিদ্যে দিয়ে?

দাদা কিন্তু বলেন তোমার বুদ্ধি নেই?

তোমার দাদার চেয়ে বেশী বুদ্ধি আছে।

তাহলে তাঁর কাছে অমন বোকা বনে যাও কেন?

উনি যে বড্ড দুষ্টু। ওঁকে জব্দ করা যায় না ঠাকুরপো?

খুব যায়।

বৌদি উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলেন। একটা কিছু করার জন্য আমার হাত ধ'রে বললেন, বল না ভাই, কিক'রে করা যায়? এমনসময় দেখা গেল অনেক দূরে দাদা আসছেন। আমি বললাম, যা বলব তা করবে?

করব।

তোমাকে আমি তোমাদের বিছানার মধ্যে মুড়ে রেখে দেব। দাদা বাসায় এসে তোমাকে না দেখে সারা বাড়ী খোঁজাখুঁজি করবেন, লজ্জায় কাউকে কিছু জিগগেস করতে পারবেন না।

বৌদি জানতেন দাদা তাঁকে খুব ভালবাসেন, বাসায় এসে না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন। তাই কথাটা তাঁর মনে খুব ধরল। বললেন, বেশ মজা হবে, কিন্তু বিছানাটা ফুলে থাকবে না?

তা থাকবে কেন? বালিশগুলি বের করে অন্য কোথাও রাখব। তুমি ছোট-খাট মানুষ, কিছুই বোঝা যাবে না।

তবে চল, এখুনি আমাকে শুইয়ে দাও।

আমি বৌদিদের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানাটা খুলে বালিশ সরিয়ে ফেলে তার মধ্যে বৌদিকে শুইয়ে রাখলাম। বিছানাটা মুড়ে রাখলে পর দেখা গেল একটা মানুষ যে তার মধ্যে আছে তা একটুও বোঝার জো নেই। আমি বললাম, আমার ডাক না শুনে তুমি বেরিও না।

আমি এসে পড়ার ঘরে বসলাম। একটু পরেই দাদা বাসার কাছে এসে পড়লেন। আমি চুপিচুপি বাইরে গিয়ে তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। তিনি হাতের ইংগিতে জানালেন, ঠিক আছে। আমি আবার চুপিচুপি ফিরে এসে বসে রইলাম।

দাদা বাসায় ঢুকেই শোবার ঘরে গিয়ে তাঁর দুই চাপরাসিকে ডাকলেন, মহাদেও. বুধিরাম। মহাদেও আর বুধিরাম ছুটে এসে বলল, হুজুউউর। দাদা বললেন, ইহ বিস্তর জলদি ধূপমে দো। ভাগ্যিস বৌদি হিন্দী জানতেন না।

সাহেবের আজ্ঞামাত্র চাপরাসীরা শশব্যস্তে বিছানার বাণ্ডিলটা জড়িয়ে ধরে বাইরে নিয়ে চলল। শূন্যে দোদুল্যমান সেই বাণ্ডিলটা থেকে নাকি স্বরে চীৎকার ক'রে বৌদি বলে উঠলেন, আঁমি আঁমি এখানে। লজ্জা পেয়ে চাপরাসীরা পালিয়ে গেল বিছানা ফেলে। দাদা যেন চমকে উঠে বললেন, এ্যাঃ তুমি এখানে! এমনসময় মঞ্জু আর মাসীমাও ফিরে এলেন। অগত্যা আমাকেও যেতে হ'ল সেখানে। বৌদির সেকি অপ্রস্তুত করুণ অবস্থা। দাদাকে বললেন, তুমি বুঝলে কিক'রে?

আমি ইঞ্জিনিয়ার, চোখের নজরের জন্যই যে মাইনে পাই।

বিছানাটা তো ফুলো ছিল না।

শীত পড়ে গেছে, বিছানাটা একটু রোদে দেব না?

মঞ্জু বলল, নিশ্চয়ই সমীরদার কারসাজি?

মাসীমা বললেন, পুরুষকে কি কখনও বিশ্বাস করতে আছে?

মঞ্জু বলল, সমীরদার সঙ্গে বৌদির আজ থেকে আড়ি।

দাদা বললেন, তোমাদের আড়িতে সমীরের বয়ে যাবে।

বৌদি বললেন, তোমার ভাই ব'লেই এমন কাজ করতে পেরেছে, আমার ভাই হ'লে এমন দুষ্কর্ম ভাবতেও পারত না।

দাদা জবাব দিলেন, সে ঠিক, তোমার ভাইরা মশা মেরে হাত কালো করেন না, তাঁরা পুকুর চুরি করেন।

বৌদি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার ভাই পুকুর চোর।

দাদা আমাকে দেখিয়ে বললেন, শনিঠাকুরকে উস্কিয়ো না, আবার কি ক'রে বসবে।

বৌদি বললেন, আর কোনোদিন বিশ্বাসই করব না।

বাগযুদ্ধ এখানেই শেষ হ'ল বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষ-সংস্থান অদল বদল হয়ে গেল। মঞ্জু, মাসীমা নারী হিসাবে বৌদির পক্ষে গেলেন। দাদা পুরুষ হিসাবে আমার পক্ষে এলেন। আমি সর্বক্ষণ ভয়ে তটস্থ হয়ে রইলাম। আমার খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, লেখাপড়া সবকিছু মাসীমার হাতে। মঞ্জু যে দুষ্টু। তারা দুজন একপক্ষ হয়ে কখন যে কিভাবে আমাকে জব্দ করবে কে জানে? বৌদি এতদিন আমার পক্ষে থাকাতে

আমিই ছিলাম বাড়ীর কর্তা, এখন তার বিপরীত। দাদাও বড় অসহায় বোধ করলেন।

কিন্তু বিধি বিরূপ বৌদির ওপর।

একদিন বিকালবেলা বাসায় ফিরতেই বৌদি ছুটে এসে বললেন, ছোড়দা এসেছেন, ঠাকুরপো। বৌদির মাসতুতো ভাই ছোড়দার কথা অনেক শুনেছি বৌদির মুখে। বৌদির সংগে গেলাম তাঁকে দেখতে। পড়ার ঘরে গিয়ে বৌদি বললেন, ছোড়দা, এই যে আমার ঠাকুরপো। আমি আর ছোড়দা দুজনই হতভম্ব, কারও মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। আমাদের অবস্থা দেখে বৌদিও স্তম্ভিত এমনসময় দাদা এসে বললেন, ব্যাপার কি? আমার মুখে কোনো কথা ফুটল না। ছোড়দা বললেন, এই শালার কাছ থেকে সেদিন চারআনার পয়সা ঘুষ নিয়েছিলুম। শুনে হাসির ধুম পড়ে গেল। দাদা বললেন, এতদিনে বোঝা গেল কে কার মাসতুতো ভাই।

পরদিন থেকে দাদা সারাক্ষণ লেগে রইলেন বৌদির পৃষ্ঠে, সংগে যোগ দিলে মঞ্জু আর মাসীমা। তবু কয়েকদিন পর আমরা ছোড়দার কথা ভুলে গেলাম। কিন্তু বৌদিই আবার মনে করিয়ে দিলেন। একদিন আমি খবরের কাগজে গভর্ণমেণ্টের একটা অপব্যয়ের কাহিনী পড়ে শোনালে দাদা বললেন, সব শালা চোর। কাছ দিয়ে বৌদি যাচ্ছিলেন, তিনি আমাদের আলোচনার আগা মাথা কিছু না শুনেই বললেন, একজনের দোষে সবাইকে বল কেন?

দাদা বললেন, কাকে বলেছি ?

যাকেই বল ওরকম কথাগুলি শুনতে ভারি বিশ্রী লাগে।

সত্যি, বৌদি কোনো অভদ্র কথা পছন্দ করতেন না। তা জেনেও দাদা বললেন, শালা কি তোমার ভাইদের বলেছি ?

মঞ্জু বলল, ঠাকুর ঘরে কে ?—কলা খাইনে।

মাসীমা বললেন, সংসারে আরও তো লোকে চুরি করে।

বৌদি বললেন, ছোড়দা বলেছেন সবাই চুরি করলে একজন চুরি না করলে তার চাকরি থাকে না।

এমনসময় স্বয়ং ছোড়দাকে আসতে দেখে আমরা সবাই চুপ করলাম। ছোড়দা এসে বললেন, আমার ঘুষ খাওয়ার কথা বলছিলে ? ওতে আমার লজ্জা নেই। ঘুষ খেয়ে বাড়ী গাড়ী ব্যাংকব্যালেন্স করতে পারলে এমন কত সাধুরা আমার পিছনে ঘুরবে। সেকথা যাক, এখন একটা ভাল খবর আছে।

দাদা জিগগেস করলেন, কি খবর ?

প্রতাপনগর কলোনি দেখতে যাবো, তোমরা ঠিক হয়ে নাও, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

খবরের কাগজে এই কলোনির প্রশংসা পড়েছি অনেক। এবার নিজের চোখে দেখে আসব।

জরুরী কাজের জন্য কেউ ছোড়দার সংগী হলেন না। কিন্তু আমাকে তিনি জোর ক'রে নিয়ে এলেন কলোনিতে।

বেলাভূমির ঊষর বুক চিরে অমৃতের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সে-বন্যাধারা অধিবাসীদের হৃদয়রাজ্যকেও সিঞ্চিত প্লাবিত ক'রে

তুলে নিয়েছে কোন্ অমৃতলোকে। সংসারের কামনা প্রলোভন, অভাব বেদনা, বিদ্বেষ বিজিগীষা, জটিলতা প্রতারণা সবকিছু এখানে অবান্তর। এক জীবন্ত আদর্শের অনুগামী হয়ে সবাই হয়ে আছে কর্মপাগল। ঘর বাড়ী গৃহস্থালী সবই সাধারণ, তবু তারমধ্যে ফুটে উঠেছে একটা হৃদয়গ্রাহী অসাধারণতা।

হঠাৎ আমার প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেল প্রভাদিকে দেখে। রক্ষা, তিনিও কর্মব্যস্ত, নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই!

আমরা একজন কর্মীর সংগে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। ভাবলাম এঁরাই প্রকৃত সাম্যবাদী বটে! মেথর ময়লা সরাচ্ছে, তারও যে হালচাল পোষাক পরিচ্ছদ, স্কুলের শিক্ষক বা কৃষিখানার ম্যানেজারেরও ঠিক সেরকম হালচাল পোষাক পরিচ্ছদ। কাকে 'আপনি' 'তুমি' বা 'তুই' ব'লে সম্বোধন করতে হবে সেটা ঠিক হয় বয়স ও বন্ধুত্বের মানদণ্ড দিয়ে, আর্থিক বা বংশগত কৌলিন্য দিয়ে নয়। ব্যাপারটা যে কত কঠিন সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম।

প্রবোধদা দেশের আর্থিক সমস্যার সাময়িক সমাধান হিসাবে ছোট ছোট পল্লীপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার কথা বলতেন। সেসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগত। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এমন অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তা ভাবতে পারি নি।

কর্মীটি বললেন, মানুষের আত্মবিশ্বাস থাকলে একাই সে নিজের পথ ক'রে নিতে পারে। কংগ্রেস আমাদের নেতা

প্রবোধদাকে ছেড়ে দিয়েছিল শত্রু ব'লে, মক্সিষ্টরাও তাঁকে ত্যাগ করেছিল শত্রু ব'লে, বোধহয় কোনো পারিবারিক ঘটনাও তাঁর মনে দিয়েছিল প্রচণ্ড আঘাত। তবু তিনি নিজের এবং দেশবাসীর ওপর বিশ্বাস রেখে একাই চলতে থাকেন আপন লক্ষ্যপথে। আজ তাই পেরেছেন এমন একটা বিরাট কাজ করতে।

প্রবোধদার নাম শুনে আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম আবার যেন তাঁর সংগে প্রভাদির মিলন হয়। অমনি ভয় হ'ল আমাকে তিনি নিশ্চয়ই ঘৃণা করেন।

ছোড়দা বললেন, এতে স্বাধীনতার কাজ কতটা এগুবে?

কর্মীটি বললেন, প্রবোধদা কখনও বলেননি শুধু এসবই দেশকে স্বাধীন করবে। আর্থিক ভিত্তি ঠিক না থাকলে রাষ্ট্রিক কাঠামো টেঁকে না। সারা দেশময় সাতহাজার কো-অপারেটিভ পল্লী-প্রতিষ্ঠান হবে আর্থিক স্বাধীনতার ভিত্তি। সামাজিক বিপ্লবও আসবে এগুলির মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক বিপ্লব আনব ইংরেজের সংগে যুদ্ধ ক'রে। স্বরাজ ও সাম্যবাদের স্বরূপ কি তার একটু আভাস আমরা দিয়ে দেব এরমধ্যে। দেশময় যখন বৈপ্লবিক বিশৃংখলতার ঘনঘটা শুরু হবে তখন তার ওপর নিষ্কাম নেতৃত্ব করতে পারবে শুধু এখানকার সুশিক্ষিত কর্মীরা।

আমি বললাম, সারা ভারতবর্ষ জু'ড়ে সাতহাজার পল্লী-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা কি সম্ভব?

নিশ্চয় সম্ভব। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা যদি সর্বত্র এ কাজে উদ্যোগী হন তা হলে কতটুকু সময় লাগবে?

টাকার দিক দিয়েও এটা লোকসানের নয়। আমাদের এখানে সবাই বাইরের কৃষক মজদুর শিক্ষকের চেয়ে সচ্ছল ও সুখী জীবন যাপন করছে। একাজে সফল হতে হলে চাই ব্যক্তিগত চরিত্রবত্তা আর সাম্যবাদী জীবনদর্শন।

চরিত্রবত্তা যদি না থাকে?

তাহলে কাজ হবে না, স্বাধীনতাও আসবে না।

মার্ক্সিষ্টরা যে বলে চরিত্রবত্তা একটা কুসংস্কার?

মার্ক্সিষ্টরা জড়বাদী, ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। শুধু চরিত্রবত্তা নয়, যাকিছু তাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখের আতিশয্যকে বাধা দেয় তাকেই তারা বলে কুসংস্কার। স্বাধীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আদর্শবাদ, সাম্যবাদ, সবকিছুকেই তারা বলে কুসংস্কার। সাম্যবাদ বলতে তারা বোঝে নিজেকে বড়দের সমান করা, ছোটকে নিজেদের সমান করা নয়।

সাম্যবাদী দর্শন কোন্‌টা?

জীবনবাদ। জীবনের পরম লক্ষ্য আনন্দ, আনন্দ আসে তৃপ্তি থেকে। দেহের কাছে যা ভাল, বুদ্ধির কাছে যা সত্য, হৃদয়ের কাছে সুন্দর সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে পেলেই আমরা পাই তৃপ্তি।

কলোনি থেকে বাসায় ফিরে এসে আমি প্রভাদি বা প্রবোধদার কথা কাউকে কিছু বললাম না। কলোনিতে সবাই জানে প্রভাদি অবিবাহিতা। প্রবোধদারও নাকি ধারণা তাই। এই বাসারও কেউ প্রভাদির বিয়ের কথা জানে না। আশ্চর্য অভিজাত পরিবারের গোপন করার ক্ষমতা!

উনিশ

দাদার আশীর্বাদ আর বৌদির সস্নেহ সহায়তা অবলম্বন ক'রে আমি আর মাসীমা একদিকে যেমন পড়াশুনায় নিবিষ্ট হ'লাম, অন্যদিকে তেমনি আবার কংগ্রেস রামকৃষ্ণ-মিশনের কাজেও যোগ দিলাম। আমাদের যুক্ত জীবনধারাটি অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমরা ঠিক করলাম পরীক্ষাগুলি শেষ ক'রে কোথাও গিয়ে নতুন একটা কলোনি শুরু করব।

আমি আর মাসীমা সপ্তাহে দুদিন গিয়ে কুলি-বস্তিতে কাজ করতে লাগলাম। মানুষ হিসাবে আমরা যেন এক নূতন স্তরে উঠে গেলাম। মাঝখানের দুঃস্বপ্নটা কেটে গিয়ে আবার পূর্বের মতো আমার জীবনের স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ মাসীমাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠতে লাগল।

একদিন শ্রমিক বস্তি থেকে ফিরে আসার পথে মাসীমার দেখা হয়ে গেল তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রীর বাবার সংগে। তিনি পেনাংএর একজন প্রভাবশালী অধিবাসী। তাঁর নাম আমিও খবরের কাগজে পড়েছি। তিনি মাসীমার সব খবর শুনে বললেন, আমাদের ওখানে স্কুলে একটা ভাল চাকরি আছে, ইচ্ছে করলে আপনি সেটা নিতে পারেন।

মাসীমা বললেন, আমার পরীক্ষা তিনমাস পরে, ওর পরীক্ষা পাঁচমাস পরে, তার আগে যে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়?

ভদ্রলোক বললেন, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, আমাদের ওখানে আপনি ছ'মাসের মধ্যে গেলেই চলবে।

কিন্তু—ব'লেই মাসীমা আমার দিকে তাকালেন। অমনি ভদ্রলোক বললেন, এরমধ্যে আর কিন্তু কি, আপনারা তুজনেই যাবেন, তুজনেরই চাকরির ব্যবস্থা হবে। আমি আপনাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে চলে যাই, পরে আপনাদের যাওয়ার সময় হ'লে আমাকে লিখবেন, টাকা পাঠিয়ে দেব।

ভদ্রলোক তাঁর ওখানকার এখানকার তুই ঠিকানা দিয়ে এবং আমাদের ঠিকানাদি নিয়ে বিদায় হলেন। রাত্রির অন্ধকার নির্জন পথে আমরা তুজন স্বপ্নে বিভোর হয়ে হেঁটে চললাম। কারও মুখে কথাটি নেই। অনেকক্ষণ পর মাসীমা বললেন, বিদেশে থেকে কি দেশের সেবা করা যায় না?

সে প্রশ্ন যারা বিদেশে থাকে তাদের জন্য।

আমরা যদি বিদেশে যাই?

শিগগিরই কংগ্রেস স্বাধীনতার আন্দোলন ভীষণভাবে শুরু করবে, এ-অবস্থায় দেশ ছাড়া উচিত নয়।

বিদেশ থেকে বিদ্যা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আমরা না হয় একটু পরে যোগ দেব।

তাতে লাভ হবে কি?

আমাদের হাতে কিছু টাকা জমাবে। সেখানে আমাদের তুজনকে নিয়ে কোনো বাজে আলোচনা কেউ তুলবে না। অনেকদিন পর ফিরে এলে এখানেও আর কেউ করবে না।

কার এমন মাথাব্যথা পড়েছে আমাদের নামে মিছিমিছি কথা বলতে? আমরা তো কারও খাব পরব না, অন্যের কথায় আমাদের কি হবে?

কিছু টাকা হলে আমরা আরেকটা কলোনি করতে পারব। সেটাই ভাববার কথা।

আমার মনে হয় গেলেই ভাল হবে, সমীর।

আমাদের লেখাপড়ার উদ্যম আরও বেড়ে গেল, স্মৃতিশক্তিও যেন বেড়ে গেল! মনে আনন্দ থাকলে মানুষের ক্ষমতা সবদিকে বেড়ে যায়। মাসীমাও জার্ণেলিজম্ পড়তে লাগলেন।

মানুষের মধ্যে যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে, ভালবাসা যে তাকে কত জাগ্রত করতে পারে তা দেখলাম মাসীমার সংকল্প সাধনের মধ্যে। তিনি আমার সংগে জার্ণেলিজম্ পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন দেখে আমি হেসেছিলাম, কিন্তু আজ আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তিনি প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেছেন।

পরীক্ষা দিয়েই আমরা পেনাংয়ে চলে যাব। মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রথম শুরু করেছিলেন সুদূর আফ্রিকাতে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে সমগ্র দেশ ভ'রে একটা আত্মোন্নতির আলোড়ন বইয়ে দিয়েছিলেন। সেরকম আমিও দেশে ফিরে ঘরে ঘরে তুলব মুক্তির তুফান।

হঠাৎ কুলিদের একটা মামলা বেধে গেল গভর্ণমেণ্টের সংগে। বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কুলিদের রক্ষা করার জন্য।

একদিন কোর্টের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরিয়েছি, সামনে এসে একটা নতুন মটরগাড়ি থামল। বেরিয়ে এলেন সান্যালদা, একেবারে অপ্রত্যাশিত। তাঁর ওপর আমার মনটা সন্তুষ্ট ছিল না। কি বলব ভেবে পেলাম না। তিনি বললেন, কোর্টে যাচ্ছ?

হাঁ।

আমার সঙ্গে চলো।

আপনি কোর্টে যাবেন?

শ্রমিকদের মোকদ্দমা দেখাশুনা করতেই এখানে এসেছি।

গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করবে না?

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ছুটো একসংগে চলে না।

মুহূর্তে তিনি আমার কাছে দেবতারূপে দেখা দিলেন। তাঁর বিপুল ত্যাগে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমন অসময়ে তাঁকে অবলম্বন পেয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

কোর্ট থেকে ফিরে আমাদের বাসার কাছে নেমে আমি বললাম, বেশ মজা হ'ল, আমরা পড়ব আপনার কাছে।

আর কে পড়বে তোমার সংগে?

চাঁপামাসীমা। চলুন না আমাদের বাসায়, ওই যে।

সান্যালদাকে বাসায় নিয়ে এলাম। খানিকক্ষণ গল্পসল্প ক'রে চা খেয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পর আমি মাসীমাকে বললাম, অদৃষ্ট ভাল থাকলে কতদিক থেকে যে সুযোগ আসে তার ঠিক নেই, নইলে সান্যালদার মতো মাষ্টার এসময়ে এখানে পাওয়া কি সহজ?

সহজ হোক, কঠিন হোক আমি তাঁর কাছে পড়ব না।

কেন?

এ ধরণের লোকদের সংগে মিশতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

তিনি যে খুব বিদ্বান।

খুব বিদ্যায় আমার কাজ নেই. তোমার কাছেই আমি পড়ব।

সান্যালদার বিদ্যার সংগে কি আমার তুলনা হয় নাকি?

অত শত বুঝি নে, তুমি ছাড়া কারও কাছে আমি পড়ব না।

এ আবার কেমন জিদ।

এমনি জিদ, ব'লে মাসীমা উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি জোর করতেই মাসীমা ছিটকে গিয়ে বিছানায় প'ড়ে বললেন, ওঃ তোমার গায়ে কি ভীষণ জোর! অপরাধীর মতো অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম, তোমার নরম গা-টা আমার গায়ে লাগলে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে যে!

তুমি কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাকবে?

তুমি ছেলেমানুষ, ভাল মাষ্টারের কাছে পড়তে চাও না।

এমনসময় বৌদি মঞ্জুকে আমাদের ঘরে টানতে টানতে নিয়ে এসে বললেন, এই যে এনেছি শ্রীমতীকে, কলকাতা কোনো লোক গেলে ওকে পাঠিয়ে দাও, ঠাকুরপো।

কেন, কি হ'ল?

সেই কোন্ সকালে গেছিল আরতি দেখতে. না খেয়ে সারাদিন শুকিয়ে এইমাত্র এল। বাপের আদুরে মেয়ে, কিছু হ'লে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

দেখ বৌদি, মাসীমা সান্যালদার কাছে পড়বেন না।

মাসীমা বললেন, পড়ব না আমার ইচ্ছে।

বৌদি বললেন, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি পড়ো, ঠাকুরপো।

মঞ্জু বলল, উনি নিজে মেয়েদের ছায়া মাড়ান না সেটা কিছু নয়, আমরা অজানা পুরুষের সংগে না মিশলেই যত দোষ।

মাসীমা বললেন, দেখলে এই বুদ্ধিটুকুও নেই তোমার।

মঞ্জু হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে গেল অন্য ঘরে। বৌদি বললেন, এই অবুঝকে তুমি বোঝাতে পারবে না চাঁপা।

আমি বললাম, শিক্ষকরা সব মনমতো মানুষ হবে নাকি?

বৌদি বললেন, তোমার ভিতরটা কি পাথর ঠাকুরপো, কিছুই বুঝবে না, কাউকে মনে রাখবে না!

মাসীমা বললেন, সে শুধু মেয়েদের বেলায়।

বৌদি বললেন, তা ঠিক, ওর যত মমতা ওর দাদার জন্য। আর দাদাটিও ঠিক তেমনি, আমরা বাঁচি কি মরি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, তাঁর যত দুশ্চিন্তা ভাইটির জন্যে।

মাসীমার জিদই বজায় রইল, সান্যালদার কাছে পড়তে রাজী হলেন না। আমারও জিদ চাপল তাঁর সে জিদ ভেংগে দিতে। রাত্রে সেকথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মানুষের গায়ে গা লেগে ঘুম ভেংগে গেল। মাসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বললাম, কি হয়েছে? আমাকে ধ'রে তিনি বললেন, বল আমাকে ছেড়ে আর তুমি যাবে না?

কেন?

না, যেতে পাবে না।

তাহলে বল সান্যালদার কাছে পড়বে ?

তুমি যদি বল তাহলে পড়ব।

পরদিন থেকে মাসীমা আমার কথা রেখে সান্যালদার কাছে পড়তে লাগলেন। আমার জীবনধারা বইতে লাগল আরও মধুর, আরও সুন্দর এক পথ বেয়ে। দেহ মন ভরপূর হয়ে উঠল অপূর্ব এক পুলকানুভূতিতে, অজানা কত মধুর সংগীত ঝংকৃত হয়ে উঠল আমার হৃদয়তন্ত্রীতে। মাসীমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পরাণ কেঁপে উঠল ডরে।

আজকাল সান্যালদার গাড়ীতে আমরা বস্তিতে যাই আসি। সময় অনেক বাঁচে, কাজ অনেক বেশী করতে পারি। আমার কর্মব্যস্ততা দেখে বৌদি বড় ভয় পেয়ে বললেন, তোমার শরীরটা কি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, ঠাকুরপো ?

কেন, আগের মতোই তো আছি।

কদ্দিন সকালে বিকালে খাওনি, একফোঁটা দুধ মুখে দাওনি ?

আমার খেয়াল হ'ল অনেকদিন ঠিকমতো খাইনি। আমি চুপ ক'রে রইলাম। বৌদি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, চাঁপার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম, আজ ঝির মুখে সব শুনে আমি অবাক।

মাসীমার সময় কই বৌদি ?

আগে পড়াশুনা কাজকর্ম ক'রে সময় পেত, আজকাল পায় না কেন ? যদি নাই পায় তো বললে না কেন, আমি কি মঙ্গু তোমার খাবারটা দিতুম।

তিনি যে আজকাল জার্ণেলিজমও পড়ছেন।

বেশ ভাল, ব'লে বৌদি তেমনি বিষণ্ণমুখেই প্রস্থান করলেন। আমি বস্তিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। সময় পার হয়ে গেল। না এল সান্যালদার গাড়ী, না বেরোলেন মাসীমা। বাড়ীর ভিতরে ফিরে গিয়ে বৌদির কাছে খোঁজ নিয়ে শুনলাম তিনি সান্যালদার বাড়ীতে পড়তে গেছেন, খবর পাঠিয়েছেন আজ আর যাবেন না বস্তিতে। আমার খুব ভাল লাগল, এখন অন্য কাজকর্ম ছেড়ে পড়াশুনা করাই ভাল তাঁর পক্ষে।

রাত্রে দেখলাম মঞ্জু আর বৌদি আমার তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে নিয়েছেন। মনটা আমার কেমন খারাপ হয়ে গেল, সকলে মিলে যেন মাসীমার শত্রু হয়ে গেছেন। অনেকরাত্রে হঠাৎ মাসীমা আমার ঘরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, সমীর।

কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, মাঝে মাঝে তুমি এমন ক'রে ওঠো কেন, বল তো?

আমি কোনোদিন কোনো ভুল করলে ক্ষমা করবে বল?

কি বলছ তুমি মাসীমা?

বল তুমি ক্ষমা করবে?

তুমি ভুল করবে কেন, করলেই বা সে-ভুল আমি ধরব কিক'রে, আর ধরলেই বা তোমাকে আমি ক্ষমা করতে যাব কোন্ আস্পর্ধায়?

একয়দিন খুব অযত্ন করেছি তোমাকে।

প:ুশুনা বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে থাকলেই তোমার হবে?

তাহোক বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে?

ধ্যাৎ! ব'লেই আমি একটা ঝাড়া দিয়ে মাসীমাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে এসে চেয়ারে পডতে বসলাম। মাসীমাও পড়তে বসলেন। পরদিন থেকে মাসীমা আবার আগের মতো আমায় দেখাশুনা ক'রে আমারি আশেপাশে থাকতে লাগলেন। সান্যালদার কাছে না গিয়ে আমার কাছে পড়াশুনা করতে লাগলেন। অমি রাগ ক'রে কত বললাম আবার গিয়ে সান্যালদার কাছে লেখাপড়া করতে, কিন্তু তিনি আমার কোনো কথাই কানে তুললেন না।

ধীরে ধীরে পূজা এসে পড়ল। শরতের আগমনী গান বেজে উঠল আকাশে বাতাসে। আমাদের পাড়ায়ও একটা পূজার আয়োজন হ'ল। আমার নাস্তিক মনে ঠাকুর-দেবতা পূজা-অর্চনার প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকলেও এই আনন্দোৎসব আমাকে তার মধ্যে টেনে নিল। মাসীমাকে বললাম, তুমি কয়েকদিন সান্যালদার কাছে পড়, পূজার পর আবার আমরা একসংগে পড়ব। মাসীমা আবার পড়তে শুরু করলেন সান্যালদার কাছে। আবার পড়ার চাপে ভুলে গেলেন আমার তত্ত্বাবধান করতে।

কুড়ি

সান্যালদার মতো বড় একজন নেতা আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেন ব'লে প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের মান সম্মান বেড়ে গেল। দাদা খুব গর্বিত, আমিও মনে মনে বেশ খুশী।

কিন্তু আমার এ আনন্দ-স্রোতে হঠাৎ ভাটা লাগল। একটানা সুখ-স্বস্তি আমার বেশীদিন সয় না।

চট্টগ্রামের মার্কিষ্ট নেতারা একটা মিটিং ডেকেছিলেন স্থানীয় টাউন-হলে। বহু সম্মানিত লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার নেল্‌সনও ছিলেন তারমধ্যে। সান্যালদা আমাকে সংগে নিয়ে সেখানে গেলেন। পূর্বঘোষিত সভাপতি ব্যারিষ্টার মিষ্টার খাস্তগীর তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ ক'রে সভার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। সবাই চুপ ক'রে বসে তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। এমনসময় মিষ্টার নেলসন্ প্রবেশ করলেন। নিজেই নিজেকে সভাপতি ঘোষণা ক'রে নূতনভাবে শুরু করলেন সভার কাজ। আশ্চর্য, কোনো প্রতিবাদ উঠল না আহ্বায়কদের কাছ থেকে। বরং মহা উৎসাহের সংগে তাঁরা সহযোগিতা করলেন তাঁর সংগে। আমি সান্যালদাকে জিগগেস করলাম, এতবড় অন্যায় সহ্য করলেন কেন?

পোর্টকমিশনের ষ্ট্রাইকটা তিনি মিটিয়ে দেবেন। তাঁকে চটালে সে-কাজটা পণ্ড হবে, হয়তো আমাদের জেলে পুরেও রাখবেন।

তাই ব'লে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন ?

এটা হচ্ছে ট্যাক্‌টিক্‌স্।

ট্যাকটিক্সের জন্য প্রিন্সিপ্‌ল্‌কে নষ্ট করবেন ?

কখনও কখনও করতে হয় বই কি। তারা যে শাদা-চামড়া একথাটা ভুললে তো চলবে না, ভাই। দুনিয়াটাকে তোমার মতো সহজ সরল মনে করো না। মুখে যা বল কাজের বেলা তাই করার জন্য যদি জেদ ধরো তাহলে বিপদ হবে। ভান করারও একটা প্রয়োজন আছে। শ্রমিকের কাজই বল আর কৃষকের কাজই বল, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়া কিছুই হবে না।

দেশের লোক যখন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আপনারা যাবেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ?

দেশের লোক অশিক্ষিত বর্বর, এদের যেদিকে চালাবে সেদিকেই চলবে।

অশিক্ষিত ব'লে এদের সাধারণ বুদ্ধি, সুখদুঃখ ভালমন্দ অনুভূতি তো আর কম নয়। এদের নির্যাতনের ওপর যে-গভর্ণমেণ্ট টিকে আছে তারই সংগে সহযোগিতা করবেন আপনারা ?

না ক'রে উপায় নেই।

সান্যালদা কতবড় বিখ্যাত সাম্যবাদী, দরিদ্র শ্রমিকদের কল্যাণই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর মুখ থেকে এমন অসহায়তার কথা শুনে বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মনে পড়ল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কথা। তাঁদের কর্মপন্থা মার্ক্সিষ্টদের মতো যুক্তিযুক্ত সুসংগঠিত নয় একথা ঠিক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে

যে নিষ্ঠা ও সাহস আছে তা মার্ক্সিষ্ট নেতারা কল্পনাও করতে পারেন না। তাই বোধহয় মার্ক্সিষ্টরা সারাক্ষণ 'জনগণ' 'জনগণ' ব'লে চীৎকার ক'রেও জনগণের মন পান না, আর বিপ্লবীরা সেসব না ক'রেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস পান।

মার্ক্সিষ্টরা জড়বাদী। তাঁরা মনে করেন জড়সুখই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, আদর্শ নীতি সবই জড়সুখের অধীন. জড়সুখ পেতে হলে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তাই তাঁরা জীবনকে বা জড়সুখকে বিসর্জন দিতে পারেন না আদর্শের জন্য। সে-প্রশ্ন উঠলেই আদর্শকে ছেড়ে আশ্রয় নেন কৌশলের। শেষপর্যন্ত আদর্শ যায় মরে, জয় হয় কৌশলের। কিন্তু বিপ্লবীরা হচ্ছেন আদর্শবাদী। আদর্শ তাঁদের কাছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান। তাঁরা মনে করেন মরণের পর মানুষ আত্মিক জীবন যাপন করে, সে-জীবনের সম্বল হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠা। তাই আদর্শনিষ্ঠার জন্য তাঁরা সাগ্রহে বিসর্জন দেন নিজের জীবন, কৌশলের আশ্রয় নেন না কখনও।

আমাকে নীরব দেখে সান্যালদা বললেন, কম্যুনিজম্‌কে সমর্থন করলেই যে মানুষ তোমার মতো হাড়ে হাড়ে সাম্যবাদী হবে সে-কথাও ভেব না, বেশীর ভাগ কম্যুনিষ্টের সাম্যবাদ হচ্ছে মৌখিক বা কৌশলাত্মক।

আমার মনটা একেবার ভেংগে গেল। চোখের সামনে সব আলো আঁধারে মিলে গেল। মানসপ্রতিমাটি ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে

লাগল। এই যদি কম্যুনিজ্‌ম্‌ হয়, তবে কিসের জন্য এত অহংকার করি আমরা ?

আমার মিনতি বিধাতার কানে পৌঁছল। আমার ডাক পড়ল সাগরপাড়ের এক গ্রামে গিয়ে কিছুদিন থাকার জন্যে। কিছুকাল আগে থেকেই একটা কথা চলছিল সকল আত্মীয় স্বজন মিলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে কয়েকদিনের জন্য ক্যাম্প ক'রে থাকবেন। ভারতভূমির প্রান্তসীমায় বংগোপসাগরের উপকূলে উৎসবের বেপরোয়া জীবন যাপনের জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তারই ব্যবস্থা করতে আমি সেখানে গেলাম।

কয়েকদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে বাসায় ফিরে এলাম। দাদা আমাকে দেখামাত্র সানন্দে বললেন, মা এসেছেন।

কবে এলেন সোনামাসীমা ?

কাল, সংগে রাংগামাসীমাও এসেছেন।

শুধু মা-ই এসেছেন ?

হাঁ, এসেই আবার চন্দ্রনাথ গেছেন।

ভীষণ ভয় হ'ল মা আমাকে দেখে রাগ করবেন। কিন্তু দাদার কথায় আমার সে-ভয় ভেংগে গেল। বললেন, রাংগামাসীমা তোকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। মা তো আনন্দে পূজো মানৎ করেছেন।

আমি বললাম, মা সোনামাসীমাকেও ক্যাম্পে নিয়ে যাব।

সব ঠিক হয়ে গেছে ?

সব ঠিক।

বেশীদিন থাকলে তোর পড়ার ক্ষতি হবে।

আমার হবে না, মাসীমার হবে।

বৌদি বললেন, চাঁপা এবার পরীক্ষা দেবে না।

তার মানে?

তাকেই জিগগেস করো মানেটা।

চলো, মাসীমাকে জিগগেস করিগে।

সে এখন বাসায় নেই। তাকে সান্যালদের সমিতির সেক্রেটারী করা হয়েছে, সে-কাজেই সান্যালের সঙ্গে বেরিয়েছে।

মাসীমা পরীক্ষা দেবেন না শুনে আমার বুকটা ভেংগে গেল। আমার ভবিষ্যৎটাও যেন অন্ধকার হয়ে গেল। কেন তিনি এমন ভয়ংকর সিদ্ধান্ত করলেন জানার জন্য মনটা পাগল পাগল করতে লাগল।

রাত্রে লাইব্রেরী থেকে বাসায় ফিরে মাসীমার ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে আছেন। বৌদিকে গিয়ে জিগগেস ক'রে জানলাম জ্বর হয়েছে। আমার ঘরের পাশেই ছিল মাসীমার ঘর। আমি শুয়ে কান পেতে রইলাম সেদিকে।

অনেকরাত্রে আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম মাসীমা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। সংসারের সবাইকে যিনি সেবা করেন তাঁর নিটোল দেহের এই অসহনীয় যন্ত্রণায় আমার প্রাণটাও ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠল। তিনি বড় অভিমানী, ব্যথায় মরে গেলেও কাউকে জানাবেন না নিজের ব্যথার কথা। সর্বজনবাঞ্ছিতা

সর্বলোক-শুভার্থিনী দেবী আজীবন পরের সেবা করেন, তাঁর মনের কথা বুঝে নিয়ে তাঁকে প্রাণপণ সেবা করার কেউ নেই।

মাসীমা আমার হাতের সেবা ভালবাসেন, মাথাব্যথায় আমি হাত বুলিয়ে দিলে তৃপ্তি পান। ধীরে ধীরে গিয়ে তাঁর শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম। কিন্তু তিনি চোখ মেলে আমাকে দেখামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, একটা পতিতার সংগে থেকেছ, এক ভদ্রবৌকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ, তোমাকে ছুঁলেও পাপ হয়, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

আমি সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। তবু নীরবে হাত-পাখাটা নিয়ে মাসীমার মাথায় হাওয়া করতে লাগলাম। তিনি 'সোনাদি' ব'লে ডেকে উঠলেন। সমুখের ঘর থেকে সোনামাসীমা সভয়ে ছুটে এলে মাসীমা বললেন, এই অসভ্যটাকে ঘর থেকে বের করে দিন। সোনামাসীমা একটু ভেবে আমাকে বললেন, যা তুই শুয়ে থাক্‌গে। আমি বেরিয়ে এলে মাসীমাকে বললেন, ছেলেদের বয়স হ'লে তাদের কাছে একটু সাবধান হতে হয়, তোমাকে দেখলে তো মুনির মনও টলে যায়।

আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। যেমন একদিন করেছিল মেজমামার চিঠি পেয়ে। আর দাঁড়াতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এমনসময় সোনামাসীমা আমার ঘরে এসে বললেন, এখানে নয়, বাইরে চাকরদের ঘরে শুয়ে থাক্‌গে। বলেই তিনি চলে গেলেন। আমি আবার উঠলাম। এ-বাসার দেওয়া সব জামা-কাপড় ছেড়ে ফেললাম। যে জীর্ণ জামা-কাপড়

প'রে প্রথম এখানে এসেছিলাম তাই শুধু প'রে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। আকাশ পানে মুখ তুলে যুক্তকরে বললাম, ঠাকুর, শম্ভূ-বাসন্তীকে সুখী করো, প্রবোধদা-প্রভাদিকে সুখী করো, সান্যালদা-মাসীমাকে সুখী করো, সোনামাসীমা দাদা বৌদি মঞ্জুর ভাল করো। মা বড়দা মেজমামাকে স্বপ্ন দেখিয়ে জানিয়ে দাও সমীর দোষী নয়।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে গেলে লোকে মনে করবে আমি সত্যি দোষী, কোনো কুমতলব নিয়েই মাসীমার কাছে গিয়েছিলাম। করুকগে মনে যা খুশি, তবু আমি কোনো প্রতিবাদ করব না। নিজের ভালর জন্যে বাসন্তী শম্ভূ প্রভাদির কথা ব'লে তাঁদের বর্তমান সম্মানিত শান্তিময় জীবনটাতে অশান্তি আনব না।

ভাবতে ভাবতে কখন রাত ফুরিয়ে গেল। ভগবানও মুখ তুলে চাইলেন। চলে যাওয়ার একটা উপলক্ষ জুটে গেল। দুজন পুলিশ কর্মচারী এসে আমাকে বলল, তোমাকে থানায় যেতে হবে। জানি পুলিশরা থানায় নিয়ে ভীষণ অত্যাচার করে, তবু এখন তাদের ডাককে বর ব'লে মনে হ'ল। আমি তাদের সংগে চলে গেলাম থানায়।

দারোগা আমাকে জিগগেস করলেন, তোমার নামে নালিশ তুমি বিপ্লবীদের সাহায্য কর।

আমি বেআইনী কাজ করিনে।

ওসব বড় বড় কথা ছেড়ে দাও, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে এই জেলা ছেড়ে যেতে হবে।

যাব, কিন্তু—

সান্যালদার গাড়িটাকে থানা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমার বাকরোধ হয়ে গেল। দারোগাও আমাকে তখনি ছেড়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে এসে সান্যালদাকে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। হয়তো তাঁর জন্যই এত সহজে ছাড়া পেলাম।

কোনোদিন না খেয়ে থাকি, কোনোদিন মোট বয়ে কিছু খেতে পাই। কখনও ষ্টেশনে জেগে ব'সে ব'সে শীতে কাঁপি, কখনও এদিক ওদিক পায়চারি ক'রে বেড়াই। এত কষ্টকেও আমার কষ্ট ব'লে মনে হয় না। সংসারপথে যে চিরবঞ্চিত, অশেষ আঘাতে বক্ষ যার বিধ্বস্ত তার তো দুঃখ করা শোভা পায় না।

কি ছিল, কি হ'ল? সরল সহজ আমার জীবনযাত্রাকে কোন্ এক কুটিল শক্তি এসে গ্রন্থিত জর্জরিত ক'রে ফেলল। আমার অশেষ হিতাকাংখিনী, আজীবন সাধনার ধন মাসীমাকে আমি অসুখের সময় সেবা করতে পেলাম না। অন্তর আমার স্মৃতির বেদনায় আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

আমি বুঝি এ বেদনা অর্থহীন। মনকে কত বলি, মন, তোর জন্য তো নয় আদর-আপ্যায়ন, কেন মিছে তুই ভেবে মরিস্ সেসব কথা। মন বোঝে না। না-পাওয়ার ব্যথা বইতে পারে কিন্তু পেয়ে হারানোর জ্বালা সইতে পারে না। একদিন যে আমাকে ভালবাসত, আমার মংগল কামনা করত, আমার পথপানে চেয়ে থাকত, আমার ব্যথায় কাঁদত, আনন্দে হাসত, পরশে পুলকিত হ'ত, আজ আমি কিছু নই তার কাছে।

কতদিনের কত গোপন কথা, নিভৃত প্রাণের কত নিবিড় ব্যথা, আত্মদানের অশ্রুভেজা কত মধুময় আকুলতা সবই আজ হয়ে গেছে মিথ্যে। একথা ভাবতেও কান্নায় চেপে আসে বুকটা। অন্তরের অন্তরতম কমলাসনে তো একাধিক লোককে বসানো যায় না। অগণিত মুহূর্তের নিগূঢ় সাধনায় আপন মরমের মাধুরীতে সিঞ্চিত সঞ্জীবিত ক'রে যাকে সেখানে অধিষ্ঠিত করলাম সে যদি অকারণে চলে যায় সেখান থেকে তাহলে সমস্ত সংসারটাই যে হয়ে যায় মরুসম শূন্য, বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে অসহায় যাতনায়, প্রাণটা উন্মুখ হয়ে ওঠে মরণকে বরণ করতে।

কঠিন পরিশ্রমের পর সিংহলে চা-বাগানে কুলির কাজ পেলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাজও পাওয়া যাবে রহমানের চেষ্টায়। আমার মন আনন্দে উদ্দীপনায় ভরপূর হয়ে উঠল। সিংহল থেকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এম. এ. পরীক্ষা দিতে পারব। কাজ আর পড়া একসংগেই চলবে।

বিজয়ার দিন সকালবেলা অষ্ট্রেলিয়াগামী একটা জাহাজে উঠে বসলাম। দেশের মাটি ছাড়ার সংগে সংগেই মনে হ'ল বিদেশে পা বাড়িয়েছি। স্বদেশের মর্যাদা স্বদেশ না ছাড়লে বোঝা যায় না। আমার দেশকে আমি কত ভালবাসতাম একটু আগেও তা জানতাম না। যার কোলে জন্ম নিয়েছি, যার ঘাস-মাটি আলো-বাতাস কথা-কাহিনী সুখ-দুঃখে মিশে গিয়ে বড় হয়েছি সেই প্রিয় দেশটি আমার পিছে পড়ে রইল। সমুখে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল অনন্ত নীল সায়রের

অগণিত তরংগমালা। আবার ফিরে আসব কিনা কে জানে?

হঠাৎ রহমান উঠে এল আমাদের জাহাজে। মুখখানি তাঁর বিদায়-ব্যথায় বিষণ্ণ। বলল, এই শিশু বয়সে নিজের দেশ ছাইড়া কই চইলা যাও, সমীর-ভাই?

আমি বললাম, নিজের দেশে যে আমার কেউ নেই।

খুব আছে। এখনও সময় আছে, তোমার নামটা কাটাইয়া দেই! চা-বাগানে কাম করলে নাকি মানুষ পশু হইয়া যায়।

আমার যে এদেশে থাকার জায়গা নেই, রহমানদা।

না থাকে আমার বাড়ীতে থাইকা ছেইলাটারে পড়াইয়া নিজেও পড়বা। নরককুণ্ডের মধ্যে যাইতে পারবা না।

আমার সব সইবে, তুমি চিন্তা করো না।

সে-যে কি কষ্ট চোখে না দেখলে ভাবাও যায় না সমীর-ভাই। বাগানের কর্তারা যেমন করে অত্যাচার তেমন করে অপমান। তোমার মতো ভাল ছেইলারে কুলি বাবু সবাই দেখব সন্দেহের চোখে। তোমারে দুইটা রাইন্ধা দেওয়ারও কেউ নাই।

রহমানদার কথা শুনে আমার মনটা বড় দমে গেল। বিদেশে যাওয়ার উৎসাহ আবার নিভে গেল। ভাবলাম নেমে থাকব কি না। রহমানদা বলল, আমার বাড়ীতে থাইকা লেখাপড়াটা শেষ কর, তারপর যত খুশী দেশ স্বাধীন কর। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম বিধর্মী অনাত্মীয় দরিদ্র লোকটির অপার উদারতায়, উৎসুক হয়ে উঠলাম তার সংগে নেমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মনে পড়ল তার বাড়ীতে মেয়েমানুষ আছে, অমনি বিগড়ে গেল

মেজাজটা। বললাম, সিংহলে আমাকে যেতেই হবে। অগত্যা রহমানদা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। আমাদের জাহাজও ছাড়তে উদ্যত হ'ল।

বিলাতে আমাকে যেতেই হবে। বিদেশীদের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারলে তবেই না আমার দেশবাসীরা আমাকে মেনে নেবে তাদের সুযোগ্য নেতা ব'লে। আজকের সুবর্ণ সুযোগ আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। নিরাশা বা ভয় কাছেও আসবে না। বিজিত বেদনা ও অতিক্রান্ত বিপর্যয়ের দুঃখদীপ্ত স্মৃতিসম্ভার মানুষকে দেয় একটা গৌরবময় আত্মপ্রত্যয়, আমাকেও কেন দেবে না?

বিকালের দিকে আমাদের জাহাজটা ডাংগার খুব কাছ দিয়ে অতি মন্থর গতিতে সমুদ্রে পড়ছিল। দেখলাম অনেক লোকজন মহোল্লাসে চড়ুইভাতি করছে। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে দেখে মনে খুব আনন্দ হ'ল। ওই যে সোনামাসীমা, দাদা, বৌদি, মঞ্জু। ওই যে শম্ভু বাসন্তী, প্রবোধদা। ওই যে আমার পরমস্নেহময়ী পরমমাতৃত্বময়ী রোগক্লিষ্টা মাসীমা। তাঁর আয়ত চোখের অতল কালো চাহনিতে ভেসে বেড়ায় অকথিত কত ভাষা, অভাবিত কত উচ্চাশা। কোথায় যেন বিসর্জনের বিষাদ-করুণ বাজনা বেজে উঠল। আমার প্রাণের ভিতরটাতেও একটা বিসর্জনের কান্না হাহাকার ক'রে উঠল। বিদায়বেলাও একটা গভীর টানে বিচলিত হয়ে উঠলাম। একদিন যে-টান ছিল সম্মুখী আজ তা হয়েছে বিমুখী, তবু তার শক্তি বেড়ে গেছে

আগের চেয়েও অনেক গুণ বেশী। বিমুখী এ-টানই আমাকে বের করেছে ঘর থেকে, আজ আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে দূর্দেশে।

না, না, মিছে কথা। আমার সংগে কারও কোনো টান নেই। আমার ওপর কোনো মানুষের মনের টান আছে একথা ভেবে আমি নিজেকে শুধু ভুলিয়ে রাখি। টান একতরফা হয় না, দুপক্ষেরই থাকা চাই। আমাকে কেউ কোনোদিন ভালবাসে না। ভালবাসার জনকে কি কেউ এমন নিক্তি দিয়ে ওজন ক'রে বিচার করতে পারে, না দোষের লেশটুকু পাওয়ামাত্র এমন নির্দয়ভাবে তাড়িয়ে দিতে পারে?

আমার কোনো গুণ নেই, তাই আমাকে কেউ ভালবাসে না। মাসীমার গুণের সীমা নেই তাই তাঁকে সবাই ভালবাসে। তাঁর সংগে সমান হতে যাওয়া আমার পক্ষে বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বড়র সংগে নিজেকে সমান দেখিয়ে লোকের কাছ থেকে বাহাদুরি কেনার অভ্যাস আমার আছে। একেই বলে চালিয়াতি। এই হীন দারিদ্র্যপূর্ণ চালিয়াতি আমাকে ছাড়তেই হবে।

ভালবাসা বাসির কোনো প্রয়োজন নেই আমার। বিশ্বদেউলে নীরবে জীবনের পূজা সমাপন ক'রে একদিন নীরবেই বিদায় নিয়ে চলে যাব এখান থেকে। যে আমার আপন হয়ে দেখা দেবে তাকেই নেব সর্বান্তঃকরণে বরণ ক'রে, কিন্তু তাকে বেশী আপন করতে গিয়ে নিজেকে মায়াজালে জড়াব না আর কখনও।

জাহাজটা তাঁদের আরও কাছ দিয়ে যেতে লাগল। কোথা থেকে রহমানদা ছুটে এসে আমার দিকে রুমাল ওড়াতে লাগল। সংগে সংগে অন্যসকলেও আমার দিকে চাইল। মাসীমাও আমার দিকে তাকালেন। আমার পরমারাধ্যা মার মুখে যেন একটা ঘৃণা ফুটে উঠল। শম্ভু, বাসন্তী মঞ্জু আমার দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে রইল। আমি ভগবানকে ডেকে বললাম, আমার যা হয় হোক, তবু মাসীমা যেন জানতে না পারেন কে সেই পতিতা মেয়ে আর কে সেই পলাতক বধূ।

আমাদের জাহাজ সমুদ্রে প'ড়েই তীব্র গতিতে চলতে শুরু করল অসীম তমসাচ্ছন্ন নিরুদ্দেশের পানে। যুক্তকরে সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম সে অসীমের পানে। দেশকালেরও কোনো সীমানা নেই, আমার পথচলারও কোনো ঠিকানা নেই।

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি,
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।